বর্ষ ২১, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২৫ সংখ্যা, মূল্য ₹ ১০০

ভূগোল স্বদেশ চর্চা

প্রথম সর্বভারতীয় বাংলা ভূগোল পত্রিকা

আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য

আধুনিক ভূ-তত্ত্বের জনক
জেমস্ হাটন (১৭২৬-২০২৬)
ত্রিশতবর্ষ ও
আধুনিক ভূমিরূপবিদ্যার জনক
উইলিয়ম মরিস ডেভিস (১৮৫০-২০২৫)
১৭৫ বর্ষ উদ্‌যাপন

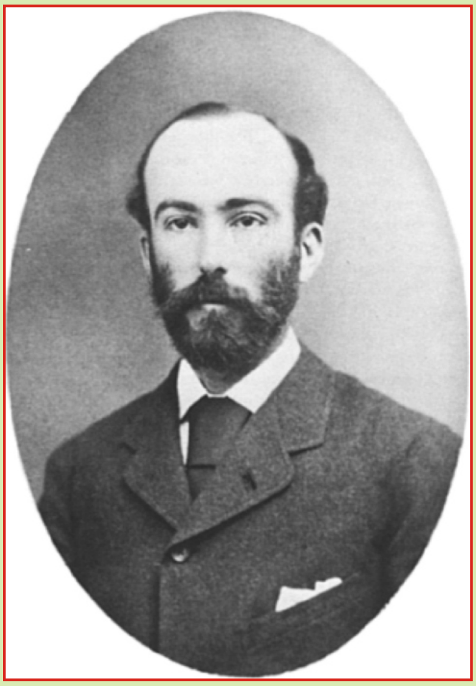

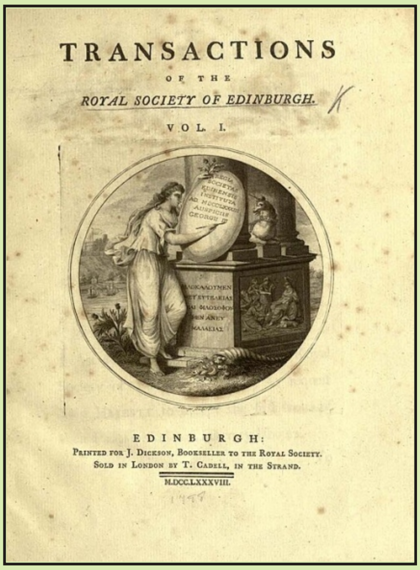
TRANSACTIONS
OF THE
ROYAL SOCIETY OF EDINBURGH.
VOL. I.

EDINBURGH:
PRINTED FOR J. DICKSON, BOOKSELLER TO THE ROYAL SOCIETY.
SOLD IN LONDON BY T. CADELL, IN THE STRAND.
M.DCC.LXXXVIII.

১৭৮৮ সালের এই
Transaction পত্রিকায়
জেমস হাটনের বিখ্যাত
'Theory of the Earth'
রচনা প্রকাশিত হয়

উইলিয়ম মরিস ডেভিস ১৮৭০ সালে হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং-এ মাস্টার্স করার পর আর্জেন্টিনা থেকে ফিলাডেলফিয়া এমনকি হার্ভাডেও গবেষণা-পড়ানোর কাজে যুক্ত হন। এই সময় তিনি বিশ্বভ্রমণে বেরিয়ে আঠাশ বছর বয়সে ১৮৭৮ সালের মার্চ মাসে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় শহর ভারত রাজধানী কলকাতায় আসেন। তার লেখায় সেই কলকাতার অভিজ্ঞতার এক টুকরো এখানে.....

"Everyone seems to have his private servant, who is to be scolded and sworn at from morning to night for most unintentional and invisible offences, and whose first duty is to Salaam and cringe and get out of the way, and who sleeps on the mat on the tiles by his master's door... we hope that gentleman in India don't behave as everyone seems to here. It is almost intolarable at table."

(Tour, 5 March, 1878, Calcutta)

ISSN 2581-4788

UGC - CARE JOURNAL
AS ON FEB 10, 2025

ISSN 2581-4788

একটি অলাভজনক শিক্ষামূলক উদ্যোগ

প্রথম সর্বভারতীয় বাংলা ভূগোল পত্রিকা

ভূগোল স্বদেশ চর্চা

BHUGOL SWADESH CHARCHA

● 21th YEAR, 2nd Vol ● July-December 2025
Registration Number : WBBEN / 2007 / 21524
Date : 25 Oct. 2007

● প্রতিষ্ঠা অনুপ্রেরণা ●
।। অধ্যাপক সুভাষরঞ্জন বসু ।।

● প্রতিষ্ঠাতা, পরিকল্পনা, রূপায়ণ ও সম্পাদনা ●
।। ড. শিশির চ্যাটার্জী ।।

আমাদের দেখুন :
bhugolswadescharcha.org

● প্রচ্ছদ ও বর্ণসৃজন ●
।। শ্রী দীপক হালদার ।।

● মুদ্রণ ●
।। প্রিন্ট আর্থ ।।
৮৯, জয়কৃষ্ণ স্ট্রীট,
উত্তরপাড়া, হুগলী

● কৃতজ্ঞতা ●
অধ্যাপক কল্যাণ রুদ্র, অধ্যাপক মলয় মুখোপাধ্যায়,
অধ্যাপক সুনন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়,
ড. পারমিতা মজুমদার,
ড. বিশ্বজিত বেরা, ড. সুমনা ভট্টাচার্য

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় *শ্রদ্ধার্ঘ্য*
ভূগোল অনুশীলনে
হাটন ও ডেভিস স্মরণ ১

সামশেরগঞ্জ সি. ডি. ব্লকের নদীপাড় ভাঙন ও
সাম্প্রতিক ব্যবস্থাপনায় স্থানীয়
মানুষের উপলব্ধি অধ্যয়ন
রূপম কুমার দত্ত,
সুমন মার্জিত
ঈষা ঝাঁ ৫

রূপনারায়ণ নদীর নিম্নাংশে পলি সঞ্চয়ের
কারণ, পদ্ধতি এবং সমস্যা
স্বপন কুমার মাইতি ১৫

পান পাতা ঃ ভারতের উপেক্ষিত সবুজ সোনা,
একটি পর্যালোচনা
দেবব্রত চন্দ ২৩

সম্পাদকীয়

শ্রদ্ধার্ঘ্য

ভূগোল অনুশীলনে হাটন ও ডেভিস স্মরণ

(ক)

তখন বাংলার গর্ভনর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত শুরু করতে চলেছেন, ইউরোপে ফরাসি বিপ্লবের আগুন ধিকি ধিকি তপ্ত করছে ইউরোপকে, আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা হলেও সংবিধান তৈরি নিয়ে কাটাকুটি চলছে অথচ পৃথিবীর তথাকথিত আলোকিত অংশের প্রভাবশালী নাগরিক সমাজে ধারণা যে মাত্র ছয় হাজার বছর আগে ২২ অক্টোবর, ৪০০৪ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে!? সপ্তদশ শতকে আয়ারল্যান্ডের আর্চবিশপ জেমস উশার মূলত বাইবেলকে কেন্দ্র করে নানাবিধ ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তার অন্যতম ছিল সেই নির্দিষ্ট ২২ অক্টোবর পৃথিবী সৃষ্টির তারিখের জন্মরহস্য, সেইসঙ্গে জীবাশ্ম বা ফসিলগুলি হল বাইবেল কথিত সুবিশাল বন্যায় মৃত ও হারিয়ে যাওয়া প্রাণী-উদ্ভিদের স্মৃতি চিহ্ন!

এমত অবস্থায় স্কটল্যান্ডের এডিনবার্গে ৩ জুন, ১৭২৬এ জন্মগ্রহণ করা এক কৃষক সন্তান প্রকৃতি বিদ্যার চর্চার সাথে সাথে শিলা ও ভূমিরূপের রহস্য সন্ধানে খুঁজে পেলেন এক নতুন বিদ্যা 'ভূতত্ত্ব' বা 'Geology'। প্রকৃত পক্ষে প্রায় চোদ্দ বছর ধরে তার পারিবারিক দুটি ছোট কৃষিজোত সামলাতে সামলাতে তিনি ভূমিভাগের নিজস্ব আত্মরক্ষার ও বিবর্তনের চরিত্র অনুধাবন করেন যে আবহাওয়া এবং আবহবিকার জনিত কার্যকলাপের সঙ্গে কিভাবে ভূ-প্রকৃতি অভিযোজন করতে থাকে। অবশেষে ১৭৮৮ সালে সদ্যগঠিত রয়্যাল সোসাইটি অব এডিনবার্গের পত্রিকা Transactions (Vol. 1, Part-2) এ বাইবেল কথিত তথাকথিত পৃথিবী জন্ম রহস্য থেকে সরে এসে ভূ-প্রকৃতির একটি বিজ্ঞানসম্মত জীবনচক্রের কথা বললেন। কোন কষ্ট কল্পিত ভাবনা নয়, শিলা ও মাটি কিভাবে সমুদ্রের জলে ধুয়ে যাচ্ছে, আদি শিলায় ঘনীভূত হচ্ছে, আগ্নেয় প্রক্রিয়ায় উৎক্ষেপিত হচ্ছে এবং আবার পরতে পরতে সেডিমেন্ট আকারে অবস্থান করছে। তার কথায়, "Is that we find no vestige of a begining, no prospect of an end". এ প্রসঙ্গে তার গবেষণার আঁতুড়ঘর

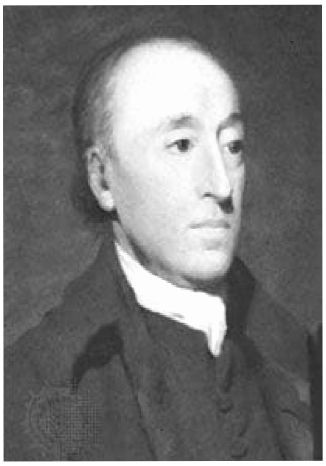

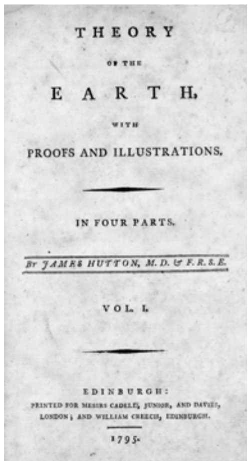

THEORY

OF THE

EARTH,

WITH

PROOFS AND ILLUSTRATIONS.

IN FOUR PARTS.

BY JAMES HUTTON, M.D. & F.R.S.E.

VOL. I.

EDINBURGH:

PRINTED FOR MESSRS CADELL, JUNIOR, AND DAVIES, LONDON; AND WILLIAM CREECH, EDINBURGH.

1795.

হিসাবে কাজ করেছিল স্কটল্যান্ডের পূর্ব উপকূলে বারউইকশায়ার কাউন্টির একটি পাথুরে ক্ষেত্র Siccar point যেখানে জেমস হাটন সময়ের সাথে সাথে শিলাস্তরগুলির পরিবর্তন ও ভাঁজ তথা আনকনফোরমিটি স্পষ্ট লক্ষ্য করেন যেখানে তিনি বোঝান পুরানো শিলাস্তর (gray shale) গুলো সমান্তরালে তৈরি হয়েছিল, পরে কাত হয়ে যায় এবং তার ওপরে নবীন সঞ্চয় (red sandstone) অনুভূমিকভাবে তৈরি হয়েছে। এই আবিষ্কার ভূ-তত্ত্বের অভিন্ন তত্ত্ব বা Uniformitism ভাবনার ভিত্তি স্থাপন

করে, যা ইঙ্গিত দেয় যে পৃথিবীর বর্তমান ভূ-তাত্ত্বিক প্রক্রিয়াগুলি অতীতের ক্রমবিকাশের জন্য দায়ী। ভূ-তাত্ত্বিক যুগের বিজ্ঞানসম্মত ধারণার জন্মও এইভাবে তৈরি হয়।

ভূগোলবিদ্যা বিনম্র চিত্তে জেমস হাটনের এই বৈপ্লবিক চিন্তার প্রতি কৃতজ্ঞ কারণ পৃথিবীর প্রাকৃতিক উপাদান ও ভূমিরূপ-এর সম্পর্ক ও বিবর্তন সম্পর্কে তার বিজ্ঞান সম্মত, যুক্তিবদ্ধ ও উদাহরণসহ বিশ্লেষণ প্রাকৃতিক ভূগোলের ভিত নির্মাণ করেছিল। শুধু ধর্ম উৎসাহীরা নন, একাধিক পণ্ডিত ও বিজ্ঞান উৎসাহীরাও মনে করতেন পৃথিবীর ভূমিরূপের বর্তমান অবস্থার মূল কারণ Catastrophism যেখানে মনে করা হয় কোন এক সময় বিরাট কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা ঘটনায় (যেমন বাইবেল কথিত বন্যা) পৃথিবীর বর্তমান ভূমিরূপের চেহারা নির্মিত হয়েছিল! জেমস হাটনের চিন্তা উনবিংশ শতকের বিজ্ঞান ভিত্তিক ভূগোল তথা ভূ-তত্ত্ব চর্চায় নতুন প্রাণ দান করে। চার্লস ডারউইন যিনি হাটনের জন্মের প্রায় ১০০ বছর পর জীব বিবর্তন নিয়ে কাজ করেছেন তিনিও প্রাকৃতিক নিজস্ব ক্রমবিবর্তন ও শৃঙ্খলার ধারণা থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, একই ভাবে হাটনের মৃত্যুর বছর (১৭৯৭) জন্মগ্রহণ করা প্রখ্যাত স্কটিশ ভূ-তত্ত্ববিদ চার্লস লায়েল যিনি Principles of Geology লিখে অবশিষ্ট বিশ্বকে প্রাকৃতিক ভূমিরূপের চরিত্র ও ক্রমবিবর্তন কে বিজ্ঞান সম্মত ভাবে বুঝিয়েছেন তিনিও জেমস হাটনের প্রজ্জ্বলিত প্রদীপের আলোয় পৃথিবীর ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক প্রক্রিয়া পরিচালিত বিজ্ঞান সম্মত ব্যবস্থাটিকে মানব সভ্যতার প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন।

কৃষক, প্রকৃতিবিদ, চিকিৎসক, রাসায়নিক নির্মাতা ও আধুনিক ভূ-তত্ত্বের জনক জেমস হাটনের জন্মের ত্রিশতবর্ষে (১৭২৬-২০২৬) ভূগোল স্বদেশচর্চার সশ্রদ্ধ স্মরণ।

(২)

তখনও ভারতে জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয়নি। সিপাহী বিদ্রোহ দমন করার পর মহারানী ভিক্টোরিয়া সদ্য ভারত সম্রাজ্ঞী খেতাব নিয়েছেন, ভারতের ভাইসরয় লর্ড লিটন কলকাতার লাটভবনে বসে একদিকে ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট এনে দেশীয় সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করছেন কারণ দেশ জোড়া দুর্ভিক্ষ ও অনাচার বাড়ছে, সীমান্তে আফগান যুদ্ধে অকাতরে অর্থ ব্যয় হচ্ছে অন্যদিকে কলকাতায় বাবু সম্প্রদায়ের সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাহেবি কেতা ও দুঃশাসন নতুন চেহারা পাচ্ছে। এমন সময় ১৮৭৮ সালের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে আঠাশ বছরের এক তরুণ প্রযুক্তিবিদ তথা ভূ-তত্ত্ব বিশেষজ্ঞ হংকং থেকে সিঙ্গাপুর, কলম্বো হয়ে মাদ্রাজ উপকূল হয়ে কলকাতায় পা রাখছেন। বিশ্ব ভ্রমণের এই পর্যায়ে তিনি গঙ্গার মোহনা থেকে বারাণসী, আগ্রা, ঘুরে দিল্লী হয়ে হিমালয় দেখতে যাবেন ব্রিটিশ ভারতের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী সিমলাতে, তারপর আবার সমুদ্র পথে লোহিত সাগর হয়ে মিশর তার গন্তব্য। ১৮৭৬ থেকে ১৯১২ সাল অব্দি হার্ভাডে পড়ানো সেই যুবক উইলিয়ম মরিস ডেভিস তখনও ভূ-বিজ্ঞান জগতে অখ্যাত নাম। তার দিদিমা লুক্রেটিয়া মট ছিলেন প্রোটেস্টান খ্রিস্টান, বিলোপবাদী নারী অধিকার কর্মী এবং যিনি ১৮৪০-এ লন্ডনের দাসত্ব বিরোধী কনভেনশনে প্রতিনিধিত্ব করে সমানাধিকার নিয়ে লড়াই করেছেন। ডেভিসের কিশোর বয়সে (১৮৬১) মার্কিন রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিঙ্কনের সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই ও মার্কিন গৃহযুদ্ধ তার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল তাই তিনি কলকাতার শ্বেতাঙ্গ ইংরেজ রাজ কর্মচারীদের ভারতীয় কর্মীবর্গের ওপর নিদারুণ অত্যাচার ও অসহনীয় বৈষম্যমূলক ব্যবহার মেনে নিতে পারেন নি। তার লেখায় গঙ্গা নদীর মোহনার চরিত্র যত না এসেছে কয়েকদিনের কলকাতা বাসের অভিজ্ঞতায় শ্বেতাঙ্গদের বৈষম্যের প্রতি চরম বিরক্তি চাচাঁছোলা ভাষায় প্রকাশ করেছেন। তিনি আমেরিকার ভূগোলের জনক বা ভূমিরূপ বিদ্যার জনক হয়েছেন বিংশ শতাব্দীর শুরুতে। ১৯০২ সালে National Society for the Scientific Study of Education-এর প্রথম বার্ষিক গ্রন্থে তিনি লিখছেন, 'Geography as a mature subject is capable of a higher development than it has yet reached. In this connection it will be well to review briefly the three stages of development recognizable in the program of our vulnerable subject. Until within about a hundred years the content of geography

consisted of a body of uncorrelated facts concentrating the earth and its inhabitants. The facts were described empirically, as a rule very imperfectly.'

ভূগোলের বিকাশ, আলোচ্যসূচী ও বিস্তার নিয়ে যখন আলোচনা চলেছে বিজ্ঞান ভিত্তিক ভূগোল চর্চার অন্তিম পর্যায়ে ও পেশাদারী ভূগোল চর্চার প্রাথমিক স্তরে (মূলত বিশ্বযুদ্ধ শুরুর আগে) তখন ডেভিস ভূগোলকে পরিণত হতে সময় দিতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন। ডেভিস যদিও নিজেকে ভূগোলের inorganic part এ সীমাবদ্ধ রেখেছেন কিন্তু কখনই organisms এবং environment এর সম্পর্কে যে ভৌগোলিক প্রেক্ষিত তৈরি হয়, যা অবশ্যই মানবীয় ভূগোলের বৃহত্তর ক্ষেত্র তার বাস্তবতাকে ভূগোলে অস্বীকার করেন নি। তিনি তার উপলব্ধি থেকে বলেছেন, 'Elementary geography may still deal with the salient facts and place man conspicuously in the foreground; more advance geography may include examples of greater complexity, try always selecting important rather than trivial matters; but the investigator must study, the trivial items along investigator with the greater ones, and all must be duly scrutinised, described and classified''.

(Courtsey : Biographical Memoir in of William Morris Davis, by Reginald A. Daly, National Academy of Sciences of USA).

উইলিয়ম মরিস ডেভিসকে তার অবদানের জন্য স্মরণ করতে হলে অবশ্যই তার ছাত্র জীবন শেষ করার পরের তিন বছর (১৮৭০-৭১) আর্জেন্টিনার আবহাওয়া কেন্দ্রের (করডোবা) কাজ, যার ফলশ্রুতি Elementary Meteorology (১৮৯৪) গ্রন্থ তার উল্লেখ করা দরকার। ১৮৭৬-এ হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগদানের আগে থেকেই ভূমিরূপের ভাস্কর্য ও তার বিবর্তন নিয়ে তার আগ্রহ তৈরি হয়। এক্ষেত্রে তার পথপ্রদর্শক হিসাবে চারজনের কথা বারবার বলতেন যার মধ্যে অগ্রগণ্য হন গ্রোভ কার্ল গিলবার্ট (১৮৪৩-১৯১৮) ও তার সহযোগী জন ওয়েসলি পাওয়েল (১৮৩৪-১৯০২) যারা শুধু আমেরিকান জিওলজিক্যাল সার্ভে প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাই নয়, ভূমিরূপবিদ্যার প্রাথমিক ধারণাগুলিও তাদের চিন্তায় নির্মিত। এছাড়া মার্কিন ভূ-তত্ত্ববিদ ক্লেরেন্স এডওয়ার্ড ডাটন (১৮৪১-১৯১২) ও ব্রিটিশ ভূতত্ত্ববিদ জোসেফ জুকস্ (১৮১১-১৮৬৯) দেরও ডেভিস তার মেন্টর বা ভূ-জ্ঞান চিন্তার শিক্ষক বলে মনে করতেন।

ভৌগোলিক উইলিয়ম মরিস ডেভিসের ১৭৫ বছরে (১৮৫০-২০২৫) স্মরণ যথার্থ পূর্ণতা পাবে তার Cycle of Erosion বা ক্ষয়চক্রের ধারণার প্রেক্ষিতের অনন্য সাধারণ উপলব্ধি আলোচনা করে।

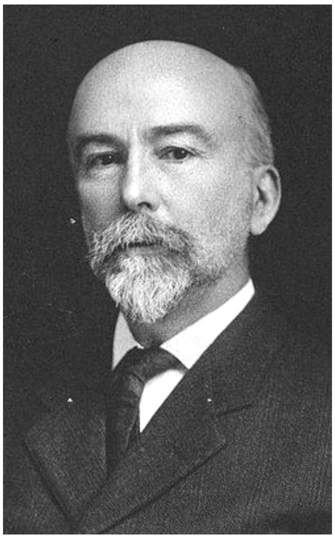

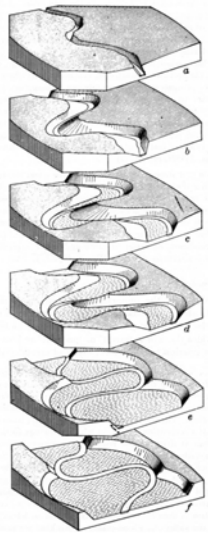

কিছু বিশেষজ্ঞদের মধ্যে নানা মতামত দেখা যায় যে ডেভিসের ক্ষয়চক্র ধারণার উৎস কি তাই নিয়ে? কেউ বলেন ১৮৭০-৭৩ সময়ে যখন তিনি মধ্য আর্জেন্টিনার করডোবাতে আবহাওয়া বিজ্ঞানী হিসাবে কাজ করতেন তখন এই ভাবনার জন্ম। পম্পাস তৃণভূমি সংলগ্ন আর্জেন্টিনার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর এলাকার প্রান্তে ৪৫০-৫৫০ মিটার উচ্চতায় পাহাড়ী এলাকা যেখানে সমতলে মিশেছে সেখানে কোথাও আগ্নেয়শিলা, কোথাও Calc-silicate শিলা বা মার্বেল এই সবের উপস্থিতি দেখা যায়। বৃষ্টির সময় এই শিলাস্তরের ঢাল বরাবর রিপল মার্কের ওপর বৃষ্টির জলকণার চলন বা movements দেখতে দেখতে inorganic পৃথিবীতে

চক্রের ধারণাটি তার প্রথম চিন্তায় আসে। কিন্তু তিনি নিজে তার ক্ষয়চক্র ধারনায় কর্মভূমি হিসাবে তার একসময়ের মাস্টারমশাই Rapheal Pumpelly-র সঙ্গে ১৮৮৩ সালের গ্রীষ্মে পশ্চিম আমেরিকার রকি পর্বতমালার নিকট কানাডা সীমান্তে মন্টানায় Northern Pacific Railroad সার্ভের কাজকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। মন্টানায় এমন একটি ভৌগোলিক অঞ্চল যার পূর্বে তৃণভূমি বা বৃহৎ সমভূমির অংশ রয়েছে, পশ্চিম প্রান্তে রকি পর্বতমালার অন্তর্গত বিটার রুট ও বিয়ার টুথসের মত পর্বত শ্রেণি আছে। এখানে গ্রীষ্মকাল উষ্ণ ও শীতকালে প্রবল ঠান্ডা এবং একটি মহাদেশীয় ডিভাইডের কারণে পশ্চিমের নদী প্রশান্ত মহাসাগরে যায় ও পূর্বের নদী আটলান্টিকে যায়। এবার স্বয়ং ডেভিসের কথা দিয়ে শেষ করা যাক কিভাবে Cycle of Erosion ভাবনার জন্ম ও ভূগোল চিন্তার বৈপ্লবিক অগ্রগতি তিনি সুনিশ্চিত করলেন—

"In the spring of 1883 I had a very discouraging letter from President Eliot. in which he said that my chance of promotion at Harvard was small and that I had better look elsewhere for it. By great good fortune my old teacher Raphael Pumpelly invited me to spend the summer of that year in Montana, where he was in charge of the Northern Transcontinental Survey for the Northern Pacific Railroad. I went out there with the idea that the Plains of eastern Montana were smooth because they had recently emerged from the sea in which their strata had been laid down. To my great surprise it was soon discovered that the Plains were fairly smooth because they had been almost completely worn down from a much greater original altitude; not down to sea level, but to so small an altitude that their rivers had gentle fall; also that since that their down-wearing their rivers had begun again to cut new valleys in consequence of some change, perhaps a small new uplift. The evidence for this conclusion was, first, the repeated occurrence of low outcrop scarps of faintly inclined resistant strata, all of which had been worn back from their original extension. Second, the occurrence of several dike walls from 100 to 500 feet in undulating height; they must have been enclosed when driven up for otherwise their lava would have spread over the Plains far and wide. Third, the presence of several lava-capt mesas, which evidently represented slight hollows in the land surface at the time of the outflow of their lava, and which survived today over the lower land worn down where not lava protected. Fourth, the Crazy Mountains, which stand 3000 or 4000 feet above the plains, because their nearly horizontal strata are knit together by a multitude of dikes.

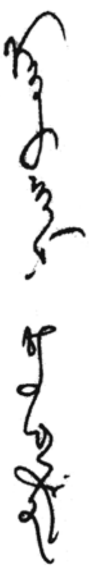

It was thus forced upon me that the plains are old, not young; also that young valleys are now incised in the old plains because of revived erosion by their rivers. The scheme of the cycle of erosion, published in the following year, was a natural outcome of this summer's observations. The following years at Harvard I introduced the natural history of rivers into my course on physical geography, and thus enlivened what had been before a very dull topic.

(Comment by Davis, written for Rigdon, 1933, pp.65-6)

ভূগোল স্বদেশ চর্চা
21th Year, 2nd Volume July-December '25
Registration No : Wbben/2007 / 21524 ● ISSN 2581-4788

সামশেরগঞ্জ সি. ডি. ব্লকের নদীপাড় ভাঙন ও সাম্প্রতিক ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় মানুষের উপলব্ধি অধ্যয়ন

*রুপম কুমার দত্ত,
**সুমন মার্জিত,
***ঈষা ঝাঁ,

সংক্ষিপ্তসার :

বর্তমান রচনায় পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক ও আর্থ-সামাজিক সমস্যাকে তুলে ধরা হয়েছে। সামশেরগঞ্জের নদীপাড় ভাঙ্গন শুধু পশ্চিমবঙ্গেরই নয় বরং ভারতের একটি ভয়াবহ জাতীয়স্তরের দুর্যোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাড় ভাঙ্গনের এই সমস্যার মাত্রা এতটাই ব্যাপক যে প্রতিবছর এই পাড় ভাঙ্গনের কারণে সামশেরগঞ্জের প্রায় ২৫শতাংশ মানুষ প্রভাবিত হয়ে থাকেন। বিশেষ করে বর্তমানে শিকদারপুর চাচন্দ ও ধূসড়িপাড়া সেনসাস টাউনের বাসিন্দারা প্রতিবছর পাড় ভাঙ্গনে তাদের বসতবাড়ি ও চাষের জমি হারাচ্ছেন। বহু মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়ে অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়েছেন। এরকমই একটি নদী-ভূমিরূপগত গুরুতর সমস্যাকে ক্ষেত্রসমীক্ষা ভিত্তিক অধ্যায়নের মাধ্যমে বর্তমান রচনায় তুলে ধরা হয়েছে। এই প্রকার সমস্যা মোকাবিলায় গৃহীত সরকারি একাধিক পদক্ষেপ সম্বন্ধে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিজ্ঞতা ও সন্তুষ্টির মাত্রা বর্তমান গবেষণায় প্রকাশ করা হয়েছে। এই রচনায় ক্ষেত্রসমীক্ষা ভিত্তিক তথ্য ছাড়াও বেশ কিছু গৌণ উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। ইউএসজিএস আর্থ এক্সপ্লোরার থেকে ২০১৪ ও ২০২৪ সালের ল্যান্ডস্যাট এইট ওএলআই উপগ্রহ চিত্র ব্যবহার করা হয়েছে ও গুগল আর্থ প্রো থেকে বিভিন্ন সময়ের উপগ্রহ চিত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইট থেকে ব্লক ও গ্রাম সীমানা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এই সামশেরগঞ্জ সি. ডি. ব্লকের ধূসড়িপাড়া সেন্সাস টাউনের ওপর নিবিড় পর্যবেক্ষণের পর দেখা যাচ্ছে যে ২০১৪ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে নদীর বাম পাড়ে ক্ষয় হয়েছে প্রায় ১.০৪৪ বর্গকিমি যা লালপুরের নিকট ও ডানপাড় বরাবর ক্ষয় হয়েছে প্রায় ৪.৬৩৫ বর্গ কিমি এলাকা যা শিকদারপুর চাচন্দ ও ধূসড়িপাড়ার নিকট যা খুবই ভয়াবহ রূপ ধারন করেছে এবং বহু মানুষকে গৃহহীন করেছে। স্থানীয় মানুষ নানান কারণে এই ভাঙ্গন ঘটেছে বলে মতামত পোষণ করেছে যেমন ফারাক্কা ব্যারেজের অতিরিক্ত জল নির্গমন, নদীর পাড়ের মৃত্তিকার গঠন, নদীর বাম পাড় বরাবর পলি প্রলেপণ ইত্যাদি। এই সমস্যা নিবারণের জন্য রাজ্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যারা বাড়ি হারিয়েছেন তাদের অন্যত্র জমি প্রদান করা হয়েছে এবং চাষের জমি যারা হারিয়েছেন তাদের ৭০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও পাড় মেরামত করার জন্য ও পাড় ভাঙ্গন রক্ষা করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে যেমন বালির ব্যাগের মাধ্যমে পাড়ের মজবুতিকরণ, বোল্ডার ভরাটকরন, নদীখাতের পলি কর্তন ইত্যাদি। যদিও রাজ্য সরকারের এই সকল ব্যবস্থাপনা নিয়ে মোটেও সন্তুষ্ট নন স্থানীয় মানুষজন, একাধিক কারণে তারা অসন্তুষ্ট যেমন- বালির বস্তা মোটেও টেকসই নয়, পুনঃ পুনঃ পর্যবেক্ষণের অভাব, সঠিক পরিকল্পনার অভাব, আবার অনেক মানুষ অপর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ নিয়ে উদ্বিগ্ন।

সূচক শব্দ: *নদীপাড় ভাঙ্গন, মৃত্তিকার গ্রথন, অভিবাসন, ব্যবস্থাপনা।*

ভূমিকা :

বর্তমান সময়ে নদী পাড় ভাঙন মুর্শিদাবাদ জেলার এক গুরুতর সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রতিবছর মুর্শিদাবাদে বিশেষ করে সামশেরগঞ্জে এই পাড় ভাঙ্গনের ঘটনা আমাদের চোখে পড়ে। বর্তমান গবেষণা পত্রটিতে মুর্শিদাবাদ জেলার সামশেরগঞ্জ সি. ডি. ব্লকের ধূসড়িপাড়া সেন্সাস টাউনের গঙ্গা পাড় ভাঙ্গনের সমস্যা ও বর্তমান ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে স্থানীয় মানুষের অভিজ্ঞতা আলোচনা করা হয়েছে। যদিও উল্লিখিত স্থানটির ভাঙ্গন সমস্যার একটি সুদীর্ঘ অতীত রয়েছে, তবে ২০১৯ সাল থেকে ভাঙ্গন সমস্যার প্রাবল্য এতটাই বাড়তে থাকে যে স্থানীয় বাসিন্দা ও প্রশাসকের কপালে ভাঁজ ফেলে। এই সমস্যাটিকে বর্ণনা করতে ক্ষেত্র সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও বিভিন্ন গৌণ উৎস

*সহকারী অধ্যাপক, ভূগোল বিভাগ, কুলতলী বি. আর. আম্বেদকর কলেজ,
ইমেইল : rkdutta.kdbra@gmail.com
**এম এ, ভূগোল, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ইমেইল: marjitsrbu@gmail.com
***এম এ, ভূগোল, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ইমেইল: isha1426@gmail.com

থেকে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা করা হয়েছে। পাড় ভাঙ্গন কবলিত এলাকায় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ অসহায় মানুষদের মতামত সংগ্রহ করে পাড় ভাঙ্গনের ব্যাপকতা ও ভয়াবহতার দিকটিকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এবং বর্তমানে এই পাড় ভাঙ্গনের জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কি কি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করেছেন ও এই ব্যাপারে স্থানীয় মানুষদের সন্তুষ্টির মাত্রা ইত্যাদি বিষয়গুলির পরিসংখ্যান ভিত্তিক বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

বর্তমানে মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের মানুষের যে অসহায় পরিস্থিতি তা জনসমক্ষে তুলে ধরা খুবই জরুরী। এই রচনার মাধ্যমে জনগণের কাছে গঙ্গা নদীপাড় ভাঙন ও তার সাম্প্রতিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করারও চেষ্টা হয়েছে।

ভৌগোলিক অবস্থান:

জঙ্গিপুর মহুকুমার অন্তর্গত সামশেরগঞ্জ সি. ডি. ব্লকটি মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে গঙ্গা নদীর ডান পাড়ে অবস্থিত, এর উত্তরে মালদা জেলা। পূর্বে বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ব্লকটির একটি সেন্সাস টাউন হল ধূসড়িপাড়া। এর মোট ভৌগোলিক ক্ষেত্রফল হলো ৩.৩১ বর্গ কিমি। এর অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশগত বিস্তার হলো ২৪ ডিগ্রি ৩৭ মিনিট ৩১ সেকেন্ড উত্তর থেকে ২৪ ডিগ্রি ৩৯ মিনিট ১১ সেকেন্ড উত্তর ও ৮৭ ডিগ্রী ৫৯ মিনিট ৪ সেকেন্ড পূর্ব থেকে ৮৮ ডিগ্রি ০ মিনিট ৫৪ সেকেন্ড পূর্ব পর্যন্ত। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী এই সেন্সাস টাউন এর মোট জনসংখ্যা হল ১৭৮০০ জন এবং জনঘনত্ব হল ৫ হাজার ৪০০ জন প্রতি বর্গ কিমি।

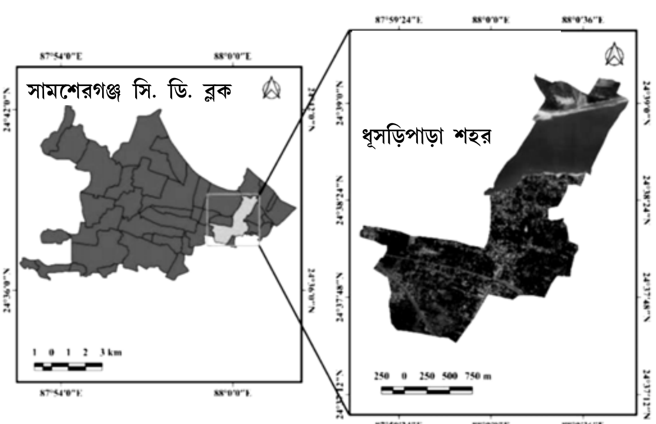

চিত্র ১: অবস্থান মানচিত্র

পূর্ব গবেষণা: বৈরাগ্য ও ঘোষ ২০২৪ সালে সামশেরগঞ্জের নদীর পাড় ভাঙ্গনের উপর কাজ করেছেন। এনারা গঙ্গার পাড় ভাঙ্গনের কারণ এবং মানুষের ওপর তার কি প্রভাব সেটি খুব ভালোভাবে তুলে ধরেছেন। ঋতু ও অন্যান্যরা ২০২৩ সালে পদ্মা নদীর পাড় স্থানান্তর ও তার ফলাফল নিয়ে কাজ করেছেন ও ভূমি ব্যবহার ও ভূমি আবরণের ওপর কি পরিবর্তন তা দেখিয়েছেন। সাহা এবং সাহু ২০২৩ সালে সামশেরগঞ্জ সি. ডি. ব্লকের ওপর নদীর পাড় ভাঙ্গনের যে প্রভাব তা বিশেষভাবে তুলে ধরেন। দাস ও সামন্ত ২০২২ সালে মালদা জেলার মানিকচক ব্লকের ওপর বন্যা ও পাড় ভাঙ্গনের প্রভাবের বিষয়টিতে গভীরভাবে দৃষ্টি আরোপ করেন। মন্ডল ২০২২ সালে পশ্চিমবঙ্গের নদী পাড় ভাঙ্গনের বিষয়টিতে গুরুত্ব আরোপ করেন। রুদ্র ২০১০ সালে, ১৭৬৪ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গা নদীর গতিশীলতা নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করেন। ইসলাম ২০১৬ সালে নদিয়া জেলায় ভাগীরথী নদীর বামপাড় বরাবর পাড় ভাঙ্গন ও তার অর্থনীতিতে ও সমাজে কিরূপ প্রভাব পড়ছে তা নিয়ে আলোচনা করেন। এই সকল পূর্ব অনুসন্ধান স্থানটির সমস্যাগুলিকে ভালোভাবে বুঝতে ও জানতে অনেক সাহায্য করেছে।

পশ্চিমবঙ্গের বহু অংশের পাড় ভাঙ্গনের ওপর বহু গবেষণা পত্র প্রতিবছর উঠে আসে, তবে সামশেরগঞ্জের গঙ্গা নদীপাড় ভাঙ্গন বর্তমানে সর্বাধিক গুরুত্ব আকর্ষণকারী একটি সমস্যা হিসেবে উঠে

এসেছে। এই স্থানের উপর পাড় ভাঙ্গনের কারণ ও প্রভাব নিয়ে বহু গবেষণা পত্র প্রকাশিত হয়েছে ও হচ্ছে তবে নদী পাড় কে ভাঙ্গনের হাত থেকে রক্ষা করতে বা মোকাবিলা করতে কি কি ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা উচিত, বর্তমানে সেখানের মানুষদের অভিজ্ঞতা বা সন্তুষ্টির মাত্রা কি রকম? সে বিষয়ে গবেষণা পত্র চোখে না পড়ার মতো, তাই আমাদের এই রচনায় সেই পাড় ভাঙ্গনের সমস্যা ও ভাঙ্গনে গৃহীত ব্যবস্থাপনা নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে যা একটি নতুন গবেষণার ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে ও সামশেরগঞ্জের নদী ভাঙন গবেষণার প্রাসঙ্গিকতা বাড়াতে সাহায্য করবে।

উদ্দেশ্য : বর্তমান গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হল সামশেরগঞ্জ সি. ডি. ব্লকের অন্তর্গত ধূসড়িপাড়া সেন্সাস টাউনে গঙ্গার পাড় ভাঙ্গনের সমস্যা পর্যবেক্ষণ, ভাঙনে বর্তমানে কি কি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা হয়েছে সেই নিয়ে আলোচনা ও নদী ভাঙ্গন মোকাবিলায় গৃহীত পদক্ষেপ গুলি প্রসঙ্গে স্থানীয় মানুষের উপলব্ধি অধ্যয়ন করা।

উপকরণ ও গবেষণা পদ্ধতি : নদী ভাঙনে সমস্যার গুরুত্বের মাত্রা বুঝে এই অধ্যায়ন ক্ষেত্রটি চয়ন করা হয়েছে। এই রচনাটি সম্পন্ন করতে আধুনিক পদ্ধতির সাথে ক্ষেত্র প্রযুক্তির প্রয়োগ করা হয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০২৪, নভেম্বর ২০২৪ ও ফেব্রুয়ারি ২০২৫ এই তিনটি পর্যায়ে ক্ষেত্র সমীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে যেখানে নদীপাড় বরাবর ৭০ টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সমীক্ষা করা হয়েছে এবং সাম্প্রতিক ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় মানুষের উপলব্ধি অধ্যয়ন করতে আরো ৪০ টি পরিবারের মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে। এই নিবিড় ক্ষেত্রসমীক্ষার পাশাপাশি নদীপাড়ের মৃত্তিকা নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। মৃত্তিকার গঠন ও বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করার জন্য পাঁচটি মৃত্তিকা নমুনা সংগ্রহ করা হয় নদীপাড় উপরিস্তর থেকে ১ মিটার অন্তর গভীরতার ব্যবধানে। এই নমুনা গুলির গ্রথন পরীক্ষা করতে গ্রেইন সাইজ এনালাইসিস পদ্ধতিটি ব্যবহার করা হয়েছে যার দ্বারা মৃত্তিকায় বালি, পলি ও কাদার আনুপাতিক পরিমাণ

চিত্র ২: নদী পাড়ের মৃত্তিকার নিম্ন স্তরে বালি মাটির স্তরের অবস্থান। (উৎস: ক্ষেত্র সমীক্ষা ২০২৪)

সম্পর্কে বিশেষ ধারণা পাওয়া যায়। ক্ষেত্রসমীক্ষার সত্যতা যাচাই করার জন্য বিভিন্ন ছবিও সংগ্রহ করা হয়েছে। ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের রাশিমাত্রিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট কতগুলি পর্যবেক্ষণে

সারণী ১: মাটিতে বালি, পলি ও কাদার শতকরা পরিমাণ

মৃত্তিকা নমুনার গভীরতা	বালি(%)	পলি(%)	কাদা(%)
পৃষ্ট স্তর	৯৯.৫৫	০.৪৫	-
১ মিটার	৯৯.৩৮	০.৬২	-
২ মিটার	৯৯.২৫	০.৭৫	-
৩ মিটার	৯৯.৪১	০.৫৯	
৪ মিটার	১০০	-	-

উৎস: ক্ষেত্র সমীক্ষা ২০২৪

পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। এই গবেষণাটিতে বিভিন্ন আধুনিক পদ্ধতির সঙ্গে ক্ষেত্র সমীক্ষা কৌশলও ব্যবহার করা হয়েছে। নদীর পাড়ের স্থানিক পরিবর্তন, ক্ষয় ও সঞ্চয়ের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করার জন্য ও ক্ষয় এবং সঞ্চয়ের ক্ষেত্রীয় পরিমাপ মানচিত্র প্রস্তুত করতে ২০১৪ এবং ২০২৪ সালের ল্যান্ডস্যাট ৮ ও এল আই উপগ্রহ চিত্র ব্যবহার করা হয়েছে। বর্তমান গবেষণায় বিভিন্ন এলাকার অবস্থানগত মানচিত্রকে উপস্থাপন করার জন্য সার্ভে অফ ইন্ডিয়া ওয়েবসাইট থেকে ব্লক ও গ্রাম সীমানা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সামশেরগঞ্জের গঙ্গা নদীর পরিবর্তন শনাক্তকরণের জন্যে ২০১১ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত দুই বছর অন্তর গুগল আর্থ ইমেজ সংগ্রহ করা হয়েছে। স্থানীয় মানুষের আর্থ সামাজিক ক্ষয়ক্ষতির প্রভাব পর্যবেক্ষণ করার জন্য ২০১১ সালের আদম সুমারির জনসংখ্যা তথ্যও সংগ্রহ করা হয়েছে।

পাড়ভাঙ্গন সমস্যার বিশ্লেষণ : ক্ষেত্রসমীক্ষা ভিত্তিক তথ্য ও একাধিক গৌণ উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই আলোচনায় পাড় ভাঙনের সমস্যার প্রধান প্রধান যে কারণগুলি উঠে আসে সেগুলি নিম্নে আলোচনা করা হলো-

১. মৃত্তিকার গ্রথন ও বৈশিষ্ট্য :

নদী পাড়ের মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্যও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে নদীর পাড় ক্ষয়ে। যদি নদী পাড় বালি মাটি দিয়ে তৈরি হয় তাহলে সেটি পাড় ভাঙ্গনের ক্ষেত্রে বেশি সংবেদনশীল হয়ে ওঠে। নদী পাড়ের মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য ভালোভাবে জানতে পাঁচটি মৃত্তিকার নমুনা সংগ্রহ করা হয়, পাড়ের ওপর থেকে নিচের দিকে। নমুনাটি সংগ্রহ করা হয় ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যখন জলের স্তর অনেক নিচে নেমে যায়। নদীর পাড়ের নিম্ন অংশের মৃত্তিকা বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে যে পাড় থেকে ৪ মিটার গভীরতার মৃত্তিকায় বালির ভাগ প্রায় ১০০ শতাংশ ফলে নিম্নের এই অংশ জলপ্রবাহে যথাযথ স্থিতিশীল অবস্থায় থাকে না, যখন জলের তীব্র স্রোতে নিচের অংশ ক্ষয়ে যায় তখন ওপরের অংশ নিজেকে ধরে রাখতে পারে না ফলে একসময় উপরের অংশ ধ্বসে পড়ে যায়। সারণি (নং-১) থেকে স্পষ্টতই লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে পাড়ের পৃষ্ঠস্তর থেকে ক্রমশ গভীরের দিকে মৃত্তিকার গ্রথণ যথেষ্ট আলগা হচ্ছে কারণ মৃত্তিকায় বালুকণার পরিমান ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

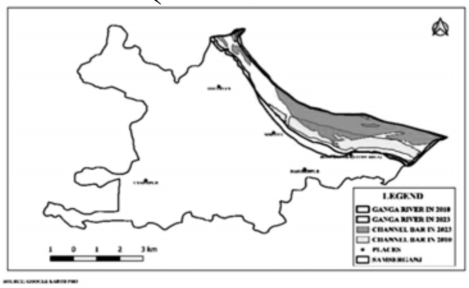

চিত্র ৩:২০১১-২০২৩ সালক্রমে নদী চরের পরিবর্তন সনাক্তকরণ (উৎস: লেখকের দ্বারা প্রস্তুত)

২. ব্যারেজ থেকে অতিমাত্রায় জলের নির্গমন:

অনেক বিশেষজ্ঞরা মনে করেন ফারাক্কা ব্যারেজ

সারণী ২: বাম ও ডান পাড়ের নদী চরের আয়তন

নদী পাড়	২০১১	২০১৩	২০১৫	২০১৭	২০১৯	২০২১	২০২৩
বাম পাড়ের চরের আয়তন (বর্গকিমি)	১.১৮	০.৮১	১.৯৩	১.৩৫	৩.১৯	৫.১৯	৭.৩৫
ডান পাড়ের চরের আয়তন (বর্গকিমি)	৪.৩৭	৩.০৩	০.৭৯	১.৫৯	০.২৮	০.১৪	০.০২

উৎস: লেখকের দ্বারা উপগ্রহ চিত্র থেকে প্রস্তুত

থেকে জল নির্গমন হলো গঙ্গার পাড় ভাঙনের অন্যতম প্রধান একটি কারণ। ১৯৪৯ থেকে ১৯৭৩ সালের নদী তথ্য থেকে ফারাক্কা ব্যারেজের জলনির্গমনের সংক্ষিপ্ত ধারণা পাওয়া যায়, সেই তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায় যে ফারাক্কা স্টেশনে গঙ্গার বার্ষিক গড় জলনির্গমন প্রায় ১২০৩৭.২ কিউবিক মিটার প্রতি সেকেন্ড (ডিসেম্বর থেকে মে- ২৪৮৪.৭৩ কিউবিক মিটার/সেকেন্ড ও জুন থেকে নভেম্বর- ২১৬৭৭.৯৮৬ কিউবিক মিটার/সেকেন্ড)। ঋতুভিত্তিক ভাবে দেখতে গেলে শুষ্ক ও বর্ষাকালীন পর্যায়ের জলনির্গমনের পরিমাণ এর পার্থক্য বিস্তর প্রায় ১৯১৯৩.২৫৫ কিউবিক মিটার/সেকেন্ড। ডিসেম্বর থেকে মে মাস পর্যন্ত যেখানে গঙ্গার জলনির্গমন খুবই কম থাকে সেখানে জুন মাসের পর থেকে জল নির্গমন ৬-৭ গুন বেড়ে যায়। এর কারণ হল বর্ষাকালীন অতিবৃষ্টি। অ-মৌসুমি পর্যায়ে নদীতে জল না থাকায় নদীর পাড়ের মৃত্তিকা শুষ্ক ও আলগা অবস্থায় থাকে, মৌসুমি পর্যায়ে হঠাৎ অতিরিক্ত জলের প্রবাহ ঘটায় সেই শুষ্ক ও আলগা মৃত্তিকা সহজেই ক্ষয়ে যায় ও পাড় ভাঙ্গনের মাত্রার বৃদ্ধি ঘটায়।

৩. নদীর বাম পাড় বরাবর পলির প্রলেপন:

পাড় ক্ষয়ের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে নদীখাতে অতিরিক্ত পলির সঞ্চয় ও চরের সৃষ্টি। নদীখাতে প্রচুর পরিমাণে পলি সঞ্চয়ের ফলে নদীখাতের ব্যাসার্ধ বা নদী খাতের গভীরতা কমে যায়, ফল স্বরূপ নদীর খাতের প্রস্থচ্ছেদক্ষেত্রও কমে যায়। নদীর বাম পাড়ে প্রচুর পলির প্রলেপণ হওয়ার কারণে সুদীর্ঘ বিন্দুচর সৃষ্টি হয়েছে সেই চরে জল বাধা পেয়ে ডান পাড়ের দিকে ধাবমান হচ্ছে, যেখানে ধূসড়িপাড়া অবস্থিত। সেই কারণে ধূসড়িপাড়া এলাকা গভীর পাড় ভাঙ্গনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।

গবেষণা চলাকালীন নদীতে পলি সঞ্চয়ের বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক লক্ষ্য করা গেছে, গুগল আর্থ উপগ্রহ চিত্রের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত চেঞ্জ ডিটেকশন মানচিত্র (চিত্র ৩) থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে- ২০১১ সালে বাম পাড়ে ও ডান পাড়ে চরের আয়তন যথাক্রমে ১.১৮ বর্গ কিমি ও ৪.৩৭ বর্গ কিমি।

২০১৩ সালে আয়তন একটু কমে যথাক্রমে ০.৮১ বর্গ কিমি ও ৩.০৩ বর্গ কিমি হয়েছিল। তবে ২০১৫ সালে হঠাৎ ডান পাড়ের চরের আয়তন কমে যায় ও বাম পাড় বরাবর পলির প্রলেপন হতে দেখা

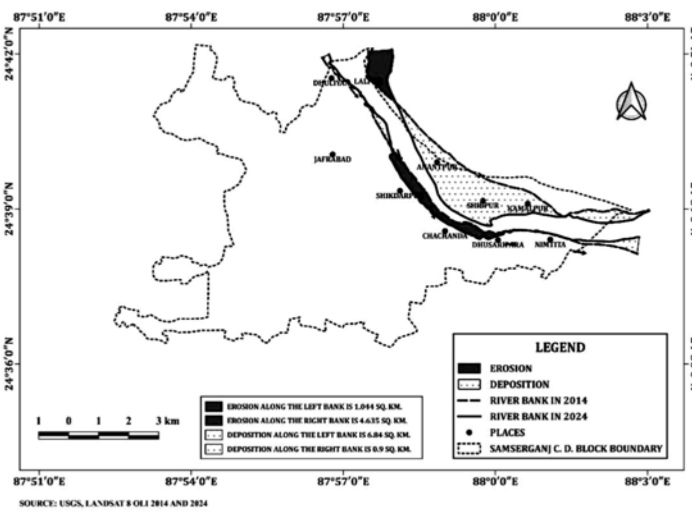

চিত্র ৪:২০১৪ থেকে ২০২৪ সালে সামশেরগঞ্জে গঙ্গা নদীর ক্ষয় ও সঞ্চয়ের ক্ষেত্রীয় পরিমাপ

(উৎস: লেখকের দ্বারা প্রস্তুত)

যায় ও চরের আয়তন যথাক্রমে ডান পাড়ে ০.৭৯ বর্গ কিমি ও বাম পাড়ে ১.৯৫ বর্গ কিমি লক্ষ্য করা যায়। ধীরে ধীরে বাম পাড়ে বিন্দুচরের আয়তন বাড়তে থাকে, ২০১৯ সালে বাম পাড়ে সুদীর্ঘ বিন্দুচর সৃষ্টি হতে দেখা যায়, যার আয়তন ছিল প্রায় ৩.১৯ বর্গ কিমি যেখানে ডান পাড়ের আয়তন ছিল ০.২৮ বর্গ কিমি। ২০২১ সালের বাম পাড়ের বিন্দুচরের আয়তন আরও বেড়ে ৫.১৯ বর্গ কিমি হয়। ২০২৩ সালে সেটির আয়তন বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছিল ৭.৩৫ বর্গ কিমি ও ডান পাড়ে চরের পরিমাণ হ্রাস পেয়ে ০.০২

বর্গ কিমি হয় বা প্রায় নেই বললেই চলে। এই পর্যবেক্ষণ থেকে এটি পরিষ্কার যে নদীর চরের স্থানান্তরণ ঘটেছে বিপুলভাবে ডান পাড় থেকে বাম পাড়ের দিকে। এই প্রক্রিয়া ইঙ্গিত করে যে নদী খাতের পলি সঞ্চয়ের গতিপ্রকৃতির মধ্যে একটি সুস্পষ্ট স্থান ও কালের ভিত্তিতে পরিবর্তনশীলতা বজায় রয়েছে। বাম পাড়ে অধিক পলি সঞ্চয়ের কারণেই ডান পাড়ে নদীর ক্ষয় অধিক পরিমাণে ঘটছে।

৪. নদী পাড়ের মৃত্তিকা কর্তন:

সামশেরগঞ্জ সি. ডি. ব্লকের কিছু কিছু গ্রামে অবৈধভাবে নদীপাড় থেকে মাটি কেটে নেওয়ার দরুন পাড় ভাঙনের ঘটনাটি আরো সক্রিয় হয়ে উঠেছে। লোহারপুর, শিকদারপুর, দক্ষিণ মহম্মদপুর, কাঁকুড়িয়া এই সকল গ্রামগুলিতে ইট ভাটা থাকায় পার্শ্ববর্তী নদীপাড় থেকে মৃত্তিকা কাটা হয়। মৃত্তিকা কর্তিত স্থানের মৃত্তিকা আলগা হয়ে অবস্থান করে ও বর্ষাকালে যখন নদীর জলের স্রোত বাড়ে তখন এই স্থানে নদীর পাড় ক্ষয় অতি তীব্র আকার ধারণ করে। যদিও বর্তমানে এই মৃত্তিকা কর্তিত স্থান নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে নদী পাড় ভাঙ্গনে।

নদীপাড় ক্ষয়ের ক্ষেত্রীয় পরিমাপ :

সামশেরগঞ্জ সি. ডি. ব্লকের পাড়ক্ষয়ের ক্ষেত্রীয় পরিমাপ জানতে ল্যান্ডস্যাট ৮ ও এল আই ২০১৪ ও ২০২৪ উপগ্রহ চিত্র এর সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এই ক্ষয়ের ক্ষেত্রীয় পরিমাপের মানচিত্র (চিত্র ৪) থেকে এটি স্পষ্ট যে গঙ্গা নদীর দুই পাড়েই ক্ষয় ঘটেছে অর্থাৎ পাড় ভাঙ্গন ঘটেছে। নদীর ডান পাড় বরাবর ২০১৪ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে প্রায় ৪.৬৩৫ বর্গ কিমি এলাকা ক্ষয় হয়েছে, ক্ষয় দেখা গেছে শিকদারপুর, চাচন্দ গ্রাম ও ধুসড়িপাড়া সেন্সাস টাউনে। বাম পাড় বরাবর প্রায় ১.০৪৪ বর্গ কিমি এলাকা ক্ষয় হয়েছে। ক্ষয় কবলিত গ্রামটি হলো লালপুর। সঞ্চয় দেখা গেছে বাম পাড়ে প্রায় ৬.৮৪ বর্গ কিমি এলাকায় এবং ডান পাড়ে ০.৯ বর্গ কিমি এলাকায়। বাম পাড়ের এই বিশাল বিন্দুচর প্রলেপন গঙ্গা নদীর খাতের প্রস্থচ্ছেদ ক্ষেত্রকে কমিয়ে দিয়েছে যার ফলে বিপরীত অর্থাৎ ডান পাড়ে অনেক বেশি ভাঙন সমস্যা দেখা যাচ্ছে।

চিত্র ৫: ভগ্নপ্রাপ্ত মনুষ্য নির্মাণ (উৎস: ক্ষেত্র সমীক্ষা ২০২৫)

সামশেরগঞ্জের জনজীবনে গঙ্গা ভাঙ্গনের প্রভাব:

সমীক্ষা ক্ষেত্রে গঙ্গা নদীর পাড় ভাঙ্গন, নদী পাড়ের জনবসতিকে বিভিন্ন দিক দিয়ে প্রভাবিত করেছে, নিম্নে সামশেরগঞ্জের জনজীবনে পাড় ভাঙ্গনের কিছু উল্লেখযোগ্য প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হলো—

১. চাষের জমি অর্থাৎ জীবিকার ওপর প্রভাব: গঙ্গা তীরবর্তী উর্বর কৃষি জমি সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে পাড় ভাঙনে। প্রাথমিক ক্ষেত্র সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত ৭০ টি পরিবারের থেকে সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী ৭০ টি পরিবারের মধ্যে ২৮ টি পরিবার তাদের কৃষিজমি হারিয়েছেন বিগত ২০১৮ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে। এই কৃষিজমির পরিমাণ ছিল প্রায় ১২৫৫.৪৮ কাঠা বা প্রায় ৬২.৭৭ বিঘার কাছাকাছি। এই জমি হারানোর পরিমাণই বুঝিয়ে দিচ্ছে পাড় ভাঙ্গনের ব্যাপক ভয়াবহতাকে। বহু পরিবার তাদের চাষের জমি হারিয়ে আজ নিঃস্ব, তারা তাদের উপার্জনের অন্য পথ খুঁজে নিয়েছেন পরিস্থিতির কবলে পড়ে।

২. মনুষ্য নির্মাণের ওপর প্রভাব: পাড় ভাঙ্গনের সবথেকে ভয়াবহ প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে গৃহস্থলির ওপর। পাড় ভাঙ্গন যখন ঘর বাড়ি গ্রাস করে নেই তখন মানুষ সর্বহারা হয়ে পড়েন। বহু মানুষের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় মাথার ওপর ছাত

টুকুও চলে যায়। প্রাথমিক সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত ৭০ টি পরিবারের মধ্যে ৩৮ টি পরিবার তাদের বাড়ি গঙ্গার পাড় ভাঙনে হারিয়েছেন, যার জমির পরিমাণ ছিল প্রায় ১১৯.৫ কাঠা বা প্রায় ৬ বিঘার কাছাকাছি। ভাঙ্গনের দ্বারা এখনো বাড়ির কোন প্রকার ক্ষতি হয়নি এরকম বহু মানুষ এতটাই শিহরিত যে তারা ভাবছেন আগামী দিনে তাদের বাড়িও পাড় ভাঙ্গনে চলে যেতে পারে, সেই জন্য তারা নিজেদের পাকা বাড়ি নিজেরাই ভেঙে ফেলছেন যাতে কিছু ইট ও অন্যান্য নির্মাণসামগ্রী পেতে পারেন এবং সেগুলি দিয়ে অন্যত্র গিয়ে বাড়ি নির্মাণ করতে পারেন। অর্থাৎ সামশেরগঞ্জের নদী ভাঙ্গন শুধু প্রত্যক্ষ ভাবে নয় পরোক্ষভাবেও বহুমানুষকে আতঙ্কিত করেছে এবং বহু মানুষ এখনো তাদের ঘরবাড়ি ভাঙতে ব্যস্ত। ক্ষেত্র সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দেখা গেছে প্রায় ৪০% (২৮ টি পরিবার) পরিবার নদী থেকে ৫০ মিটারের মধ্যে বসবাস করছেন এবং প্রায় ৫৭% (৮০ টি পরিবার) পরিবার ২০০ মিটারের অধিক দূরত্বে বসবাস করছেন। যে সকল ঘরবাড়ি ৫০ মিটারের মধ্যে অবস্থান করছে সেগুলি বর্তমানে খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। প্রায় ৫১% পরিবার মনে করছেন যে ভবিষ্যতে তাদের বাড়িও পাড় ভাঙ্গনে হারানোর সম্ভাবনা আছে কারণ তাদের বাড়ি বর্তমানে নদী পাড়ের খুব কাছেই অবস্থিত।

৩. বিঘ্নিত যোগাযোগ ব্যবস্থা: পাড় ভাঙনের কবলে বহু রাস্তাঘাট সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়েছে। সামশেরগঞ্জের বেশ কিছু গ্রামে এরকম ঘটনা পরিলক্ষিত হয়েছে, যেখানে পুরো রাস্তা নদী গর্ভে চলে গেছে। যোগাযোগের মাধ্যম নষ্ট হওয়ায় এই এলাকায় এক সামাজিক দূরাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যোগাযোগ, লেনদেন, কর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামের মানুষ।

৪. পারিবারিক উপার্জনের ওপর প্রভাব: ঘর বাড়ি ও উর্বর চাষের জমি হারিয়ে এই এলাকার বহু মানুষ উপার্জনহীন হয়ে পড়ছেন। এরফলে তারা বিভিন্ন নতুন কাজের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন যেমন বিড়ি বাঁধার কাজ, রাজমিস্ত্রী, দিন মজুর, মৎস্য শিকার ইত্যাদি। কাজের উদ্দেশ্যে কেউ কেউ অন্য রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছেন। ৩৪% মানুষ জানিয়েছেন যে তাদের অর্থনৈতিক উপার্জনের সক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে পেশা পরিবর্তনের কারণে।

৫. পুনর্বাসন ও পরিব্রাজন : নদী পাড় ভাঙ্গনে বিপর্যস্ত বহু মানুষ তাদের বাসস্থান অন্যত্র স্থানান্তরিত করেছেন। যেমন বহু পরিবার নদীপাড় থেকে ২ কিমি ; ২.৫ কিমি দূরবর্তী মধুপুর, বাসুদেবপুর, নতুন শিবনগর গ্রামে তাদের বাড়ি তৈরি করে বসবাস করছেন। বহু মানুষ বাধ্য হয়ে তারা তাদের বাসস্থান ছেড়ে অন্যত্র পরিব্রাজন ঘটিয়েছেন (চিত্র: ৬)।

চিত্র ৬: স্থানীয় বাসিন্দাদের অন্যত্র পুনর্বাসনের দৃশ্য (উৎস: ক্ষেত্র সমীক্ষা ২০২৪)

বর্তমান প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাপনা : নদীর পাড় ভাঙ্গন রোধ করতে যে বাঁধ নির্মাণ করা হয় তার নিরন্তর পর্যবেক্ষণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, বিশেষ করে যে এলাকায় প্রতি বছর পাড় ভাঙ্গন ঘটে। বাঁধের অবস্থা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অগ্রিম বাঁধ সুরক্ষা ব্যবস্থাপনা কি কি নেওয়া যেতে পারে সেগুলির পরিকল্পনা করা যায়। নদী পাড়কে রক্ষা করতে সামশেরগঞ্জে সাম্প্রতিক কিছু কৌশলগত পদ্ধতি নেওয়া হয়েছে। যেমন-

১. বালির ব্যাগের ব্যবহারের মাধ্যমে পাড়ের মজবুতিকরন: নদীর পাড় বরাবর যদি কোনো চরের সৃষ্টি হয় সেই চর থেকে বালি কেটে বা অন্য কোনো স্থান থেকে বালি বস্তায় পূর্ণ করে নদীর পাড় বরাবর নাইলন দড়ির জালের মধ্যে বালির বস্তা গুলিকে ভাঙ্গন কবলিত পাড়ে সারিসারি ও স্তরীও ভাবে সাজিয়ে রেখে পাড় বাঁধানো (চিত্র: ৭) হলে নদীর পাড় অনেকটাই মজবুত হয়। বর্তমানে এই পদ্ধতিটি

ব্যবহার করা হচ্ছে সামশেরগঞ্জের পাড় ভাঙ্গন প্রতিরোধ করতে।

চিত্র ৭: নদীর পাড় মজবুত করতে নাইলনের দড়ি ও বালির বস্তার ব্যবহার (উৎস: ক্ষেত্র সমীক্ষা ২০২৪)

২. বোল্ডার ভরাটকরণ: ভগ্ন পাড় বরাবর পাড়ের সঙ্গে উল্লম্বভাবে বোল্ডার ভরাট করণের মাধ্যমে নদীর পাড় কে তীব্র জলস্রোতের আঘাত থেকে রক্ষা করা হয়। ত্রিকোণাকার ও ভারী বোল্ডার গুলিকে মজবুত ভাবে একে ওপরের ওপর ফেলে বাঁধের মত তৈরি করা হয়। আবার নদীপাড়ের সঙ্গে সমান্তরালে বালির বস্তাগুলিকে টিকিয়ে রাখতে গর্ত করে বোল্ডার ভরাটকরনের মাধ্যমে নদীপাড় মজবুত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে সামশেরগঞ্জের পাড় ভাঙ্গন প্রতিরোধে করতে উল্লিখিত ব্যবস্থাপনা নেওয়া হয়েছে।

ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে স্থানীয় মানুষের সন্তুষ্টির মূল্যায়ন: নদীর পাড় ভাঙনের বর্তমানে গৃহীত ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে সন্তুষ্টি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সাধারণত জনসাধারণের ধারণা, সমস্যাটির প্রতি বোধগম্যতা, জীবিকার উপর প্রভাব, সমস্যার তীব্রতা বোঝা এবং এটি মোকাবিলায় সরকার এবং সম্প্রদায়ের উদ্যোগের প্রতি সন্তুষ্টি পরিমাপ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই সমীক্ষাটি সম্পূর্ণ করতে ৪০ জন ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন এমন স্থানীয় ব্যক্তির মতামত সংগ্রহ করা হয়। তাদের মতামতের মাধ্যমে যেগুলি উঠে এসেছে তা নিম্নরূপ-

১. বর্তমান ব্যবস্থাপনা নিয়ে স্থানীয় মানুষের অভিজ্ঞতা: সমীক্ষা থেকে উঠে আসা তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে যে প্রায় ৭২.৫% মানুষ এই ব্যবস্থাপনা কাজের প্রতি অসন্তুষ্ট, ১০% মানুষ কম সন্তুষ্ট এবং ১২.৫% মানুষ মাঝারিভাবে সন্তুষ্ট। অতএব, মাত্র ৫% মানুষ এই ব্যবস্থাপনার কাজ সম্পর্কে সন্তুষ্ট। অসন্তুষ্টির মাত্রা অনেক বেশি কারণ বর্তমান ব্যবস্থাপনা প্রতি বছরের পাড় ভাঙনের সমস্যা নিবারণে ব্যর্থ হচ্ছে। পাড় ভাঙনও চরমভাবে চলছে। এই নদী ভাঙনের প্রভাব অধ্যয়ন এলাকায় খুবই নেতিবাচক। নদী ভাঙনের জন্য সমীক্ষিত সামশেরগঞ্জ এলাকার আর্থ-সামাজিক পরিলেখ দিন দিন হতাশাজনকভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। এর ফলে এলাকার শিক্ষাগত মান অর্থনৈতিক, ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব হ্রাস পাচ্ছে। এই সমস্যাটি কাটিয়ে উঠতে সরকারের অবশ্যই কিছু পদক্ষেপগুলি দেখা যাচ্ছে কিন্তু সেগুলি যথেষ্ট নয়।

২. বর্তমান ব্যবস্থাপনা নিয়ে অসন্তুষ্টির কারণ: ৪৫% মানুষ বালির বস্তা দিয়ে বাঁধ নির্মাণ নিয়ে অসন্তুষ্ট কারণ প্রতি বছর এই বালির বস্তা জলের স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে চলে যায়। ২৭% মানুষ স্থায়ী সমাধান না পাওয়ার বিষয়ে উদ্বিগ্ন এবং ১৫% মানুষ অপর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ নিয়ে উদ্বিগ্ন ও ১৩% বাসিন্দা সরকারি অবহেলায় অসন্তুষ্ট।

৩. অভিবাসন নিয়ে স্থানীয় মানুষের মতামত: সমীক্ষা অনুসারে ৬৫% মানুষ এই গ্রামে থাকতে চান কারণ এটি তাদের জন্মস্থান, এই স্থানের সাথে তাদের কিছু আবেগগত সংযোগ রয়েছে, পুনর্বাসনই একমাত্র সমাধান নয় বলে তারা বিশ্বাস করেন। তবে ৩৫% মানুষ তাদের পরিবার এবং সম্পত্তির সুরক্ষার জন্য অন্য কোথাও স্থানান্তরিত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। যদিও যেসব মানুষেরা তাঁদের গৃহ হারিয়েছেন সরকার থেকে তাদের বাসুদেবপুর, মধুপুর ও নতুন শিবনগর এলাকায় ১ কাঠা করে জমি দেওয়া হয়েছে যা বর্তমান নদীখাত থেকে মাত্র ২.৫ কিমি দূরে অবস্থিত। অপরপক্ষে, যারা চাষের জমি হারিয়েছেন তাদেরকে ৭০ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত মানুষেরা মনে করেছেন এই ক্ষতিপূরণ অপর্যাপ্ত। অপর্যাপ্ত ব্যবস্থাপনা এবং ক্ষতিপূরণ বহু মানুষকে আরও অসহায় করে তুলেছে। মানুষ এই সমস্যার দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের জন্য অপেক্ষা করছে, বর্তমান ব্যবস্থাপনা কৌশল মানুষকে আরও হতাশ এবং অসন্তোষের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

তারা অবিলম্বে একটি সঠিক ব্যবস্থাপনার দাবি জানায় যা তাদের একটি শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ জীবনযাপনে সহায়তা করবে।

উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ: এই বৈজ্ঞানিক অধ্যয়নের ভিত্তিতে কিছু বিশেষ পর্যবেক্ষন উল্লেখ করা হল-

১. এই অধ্যয়নের পর বলা যায় যে ধূসড়িপাড়া সংলগ্ন স্থানে পাড় ভাঙ্গনের প্রধান দুই কারণ হলো ক. ফারাক্কা থেকে অধিক জলনির্গমন ও খ. নদীর বাম পাড় বরাবর বিশাল বিন্দুচরের সৃষ্টি।

২. সর্বাধিক নদীখাতের স্থানান্তর দেখা গেছে বাম পাড়ে শিবপুরের কাছে যা প্রায় ১৭৩৫.৩৭৫ মিটার, ডান পাড় বরাবর সর্বাধিক স্থানান্তর দেখা গেছে চাচন্দ ও ধূসড়িপাড়ার কাছে যা প্রায় ৩৮৮.১৯৭ মিটার।

৩. যে সকল মানুষ ঘরবাড়ি হারিয়েছেন তারা সরকার থেকে ১ কাঠা করে জমি পেয়েছেন বাড়ি তৈরির জন্য এবং যারা চাষের জমি হারিয়েছেন তারা পেয়েছেন ৭০ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ।

৪. ২০১৪ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে বাম পাড় বরাবর ১.০৪৪ বর্গ কিমি ও ডান পাড় বরাবর ৪.৬৩৫ বর্গ কিমি এলাকা পাড় ভাঙ্গনে ক্ষয় হয়েছে।

৫. নদীপাড় ভাঙ্গন প্রতিরোধে বর্তমানে গৃহীত ব্যবস্থাপনার প্রতি মানুষের বিশেষ ভরসা নেই তারা সামশেরগঞ্জের রক্ষায় একটি সঠিক ও স্থায়ী সমাধানের দাবি করছেন।

বর্তমান ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রধানত বালির বস্তা দিয়ে বাঁধ মেরামত মূলত অস্থায়ী এবং অকার্যকর, যা স্থানীয় বাসিন্দাদের সুস্পষ্ট অসন্তোষের মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হচ্ছে। নদী পাড় বাঁধানোর দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে এবং তীরবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী ঝুঁকিপূর্ণ সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করার জন্য একটি সুসমন্বিত এবং দীর্ঘস্থায়ী কৌশল অপরিহার্য যা এলাকার দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নকে স্বাগত জানাবে।

REFERENCE

Ali. A., (2024). 81 Brahmaputra River Bank Erosion as a Major Geo-Environmental Problem in Lower Assam, India. Jour. Geol. Soc. India– vol. 100, 2024 Apr., pp.463-616

Bairagya. D. S., Ghosh. S., (2024). River bank erosion— causes and impact on human life, a case study of Samserganj Block– Murshidabad, West Bengal. Int. j. adv. Multidisc. res. stud. 2024— 4(2)-774-781

Billah M.M., (2018). Mapping and monitoring erosion-accretion in an alluvial river using satellite imagery-the river bank changes of the Padma River in Bangladesh. Quaestiones Geographicae

37(3), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznan, pp. 87–95.

Census of India. (2011). District census hand book- village and town directory (Part-XII-A, series-20). Directorate of census operations West Bengal.

Das, R, & Samanta, G. (2022). Impact of foods and river bank erosion on the riverine people in Manikchak Block of Malda District, West Bengal.

District Survey Report, Murshidabad, West Bengal.

Ghosh, D. (2022). Identification of prime factors of active river bank erosion in the lower course of Ganga Bhagirathi River: a study.

Islam, A. (2016). River bank erosion and its impact on economy and society a study along the left bank of river Bhagirathi in Nadia district, West Bengal. PhD thesis, The University of Burdwan Shodhganga.

Lovric N., Tosic R., (2016). Assessment of bank erosion, accretion and lateral channel migration using remote sensing and Gis- case study Lower part of the Bosna River. Quaestiones Geographicae 35(1), Boguckin Wydawnictwo Naukowe, Poznan, pp. 81–92

Mondal, M (2022). River Bank Erosion in West Bengal. Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language, Online ISSN 2348-3083, SJ Impact Factor 2021-7.278,. Peer Reviewed & Refereed Journal– Dec-Jan–2022, Vol-10/49

Pal, R. and Pani, P. (2016). Seasonality, barrage (Farakka) regulated hydrology and flood scenarios of the Ganga River- a study based on MNDWI and simple Gumbel model. DOI 10.1007/s40808-016-0114-xModel. Earth Syst. Environ. (2016) 2-57

Panda, S and Bandyopadhyay, P. (2010). Morpho dynamic Changes of Bhagirathi River at Murshidabad District Using Geoinformatics.

Rabbi. Et al. (2013). Recent Study on River Bank Erosion and Its Impacts on Land Displaced People in Sirajgonj Riverine Area of Bangladesh. Department of Environmental Science and Resource Management– Mawlana Bhashani Science and Technology University, Tangail-1902, Bangladesh, Center for Environmental and Geographic Information Services (CEGIS), Department of Chemistry– Mawlana Bhashani Science and Technology University, Tangail-1902, Bangladesh

Ritu, S. M. et al. (2023). Prediction of Padma River bank shifting and its consequences on LULC changes. Department of Urban and Regional Planning, Khulna University of Engineering & Technology (KUET), Khulna 9203– Bangladesh. https-//doi.org/10.1016/j.ecolind.2023.111104

Rudra, K. (2010). Dynamics of the Ganga in West Bengal, India (1764-2007)- implications for science-policy interaction. QuatInt Article Sin pressV doi-10.1016/j.quaint.2009.10.043

Saha, P. & Sahu, A.S. (2023). Impact of riverbank erosion on riparian society- a micro-level study along the Ganga-Padma River in Samserganj C.D. Block of Murshidabad District, West Bengal. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 60(60)- 61-79. DOI- http-//doi.org/10.12775/bgss-2023-0016

Thakur. et al. (2012). River bank erosion hazard study of river Ganga–upstream of Farakka barrage using remote sensingand GIS. Natural Hazards DOI- 10.1007/s11069-011-9944-z

ভূগোল খবর

ইথিওপিয়ার আগ্নেয়গিরির ছাই-মেঘ ভারতে

প্রায় ১২,০০০ বছর। কোনও সাড়া করেনি হেইলি গুরি। আফ্রিকার ইথিওপিয়ার আফার অঞ্চলে ঘুমিয়েছিল। ২৩ নভেম্বর সকালে প্রথমবার ঘুম ভাঙে। আর হেইলি গুব্বি আগ্নেয়গিরি জেগে উঠতেই ঘুম ছুটেছে ভারতের। আগ্নেয়গিরির মুখ থেকে লাভার সঙ্গে বেরিয়ে আসা ছাই মেঘ দূর-দূরান্তে ছড়িয়েছে। সুদূর আফ্রিকা থেকে লোহিত সাগর পেরিয়ে ইয়েমেন, ওমানের আকাশপথ টপকে পাকিস্তান হয়ে সেই ছাইয়ের মেঘ গুজরাট, রাজস্থান, পাঞ্জাব ঘুরে দিল্লি-এনসিআরের আকাশে। বায়ুদূষণের কবলে দিল্লির নাভিশ্বাস ওঠার উপক্রম। তার ওপর ছাইমেঘ দোসর। দূষণের মাত্রা আরও বৃদ্ধির আশঙ্কা দেখা দেয়। ছাই মেঘের কারণে ওই দিন রাত থেকে বিমান চলাচল ব্যবস্থা ধাক্কা খেয়েছে।

বারো হাজার বছর পর ইথিওপিয়ার আগ্নেয়গিরি হেইলি গুব্বির অগ্ন্যুৎপাত হল কেন? দিল্লি থেকে ইথিওপিয়ার দূরত্ব ৪,৫৫০ কিমি (২,৮২৭ মাইল)। ছাই-মেঘ দিল্লি পৌঁছয় কীভাবে? সাবট্রপিক্যাল জেট স্ট্রিমের প্রভাবে বায়ু দক্ষিণ এশিয়ার দিকে বইতে শুরু করে। ওই জেট স্ট্রিমের প্রভাবেই মেঘ-ছাই দিল্লির আকাশে প্রবেশ করেছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিরল ঘটনা। যদিও ভেতরে লাভা তৈরির মতো পরিস্থিতি থাকলে এক হাজার বা দশ হাজার বছর অগ্ন্যুৎপাত না হলেও তার পর হতে পারে।

আফ্রিকার আদ্দিস আবাবা থেকে ৮০০ কিমি উত্তর-পূর্ব দিকে আফার প্রদেশ। ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চল। ২৩ নভেম্বর সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ বিকট আওয়াজ করে ঘুম থেকে জেগে ওঠে সুপ্ত আগ্নেয়গিরি হেইলি গুব্বি। মুখ থেকে গল গল করে বেরিয়ে আসে উত্তপ্ত লাভা। ধোঁয়া আর ছাই আকাশের ১৪ কিমি ওপরের দিকে অর্থাৎ ৪৫ হাজার ফুট উচ্চতায় ৯ মাইল এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। সেখান থেকে ক্রমশ সালফার-ডাই-অক্সাইড মিশ্রিত ছাই মেঘ আর ধোঁয়া ইয়েমেন, ওমানের দিকে এগোতে থাকে। তারপর পাকিস্তান হয়ে আরব সাগর পেরিয়ে ভারতে আসে।

তথ্যসূত্র : আজকাল পত্রিকা।

ভূগোল স্বদেশ চর্চা
21th Year, 2nd Volume July-December '25
Registration No : Wbben/2007 / 21524 ● ISSN 2581-4788

রূপনারায়ণ নদীর নিম্নাংশে পলি সঞ্চয়ের কারণ, পদ্ধতি এবং সমস্যা

স্বপন কুমার মাইতি

সংক্ষিপ্তসার :

মিষ্টি জলের বাস্তুতন্ত্রের ব্যবস্থাপনায় বিশ্বব্যাপী একটি প্রধান সমস্যা হল নদীর তলদেশে পলি সঞ্চয়। বিশ্বের এবং ভারতের বেশিরভাগ গুরুত্বপূর্ণ নদীগুলি দ্রুত পলি সঞ্চয় এবং তার সাথে সম্পর্কিত আর্থ- সামাজিক ও পরিবেশগত সমস্যা ও বিপদের সম্মুখীন হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে তিস্তা, তোর্সা, জলঢাকা, মহানন্দা, দামোদর, শিলাবতী, দ্বারকেশ্বর, রূপনারায়ণ, কংসাবতী প্রভৃতি নদীর তলদেশে দ্রুত পলি সঞ্চিত হচ্ছে। রূপনারায়ণ নদীর উপর বিভিন্ন গবেষকদের গবেষণা থেকে জানা যায় যে কোলাঘাট থেকে গেঁওখালী পর্যন্ত প্রসারিত নদীর নিম্নাংশে পলি সঞ্চয়ের সমস্যা সবচেয়ে বেশী গুরুতর। গত ৩০ বছরে রূপনারায়ণ নদীর নিম্নাংশে প্রায় ৩২.৪৫ মিলিয়ন ঘনমিটার পলি জমা হয়েছে। ১৯৭৩ সালে মোট পলি সঞ্চিত এলাকা ছিল প্রায় ১৫.৪১ বর্গকিলোমিটার এবং ২০২০ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫৯.৬৩ বর্গকিলোমিটারে। দ্রুত পলি সঞ্চয়, নদীবক্ষে চর এলাকা (shoal area) -র সৃষ্টি ও তার বিস্তারের ফলে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিচ্ছে। যেমন নদীতে দ্রুত জল নিষ্কাশনের সমস্যা, নদীর সংকোচন, নাব্যতা হ্রাস, কৃষি ও অন্যান্য কাজে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় মিষ্টি জলের অভাব, জল জমে যাওয়া ও ফলস্বরূপ বন্যা, নদীর পাড় ভাঙন এবং সম্পত্তির ক্ষতি প্রভৃতি।

সূচক শব্দ: *নদীর তলদেশে পলি সঞ্চয়, রূপনারায়ণ নদীর নিম্নাংশ, জলপ্রবাহের বিভাজন, জোয়ার-ভাঁটার সময়ের অপ্রতিসমতা, পলি সঞ্চয়ের সমস্যা।*

ভূমিকা:

নদীবক্ষে পলি সঞ্চিত হওয়া মিষ্টি জলের বাস্তুতন্ত্রের ব্যবস্থাপনায় একটি বিশ্বব্যাপী সমস্যা। বিশ্বের এবং ভারতের বিপুল সংখ্যক প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ নদীগুলি (আমাজন, নীলনদ, হোয়াং হো, মেকং, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি) দ্রুত পলি সঞ্চয়ের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। এর ফলে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত সমস্যা এবং সেই সম্পর্কিত বিভিন্ন বিপর্যয় যেমন নদীর বহন ক্ষমতা হ্রাস ও তার ফলে বন্যা, নদীর পাড় ভাঙন, সম্পদ নষ্ট ও প্রাণহানি প্রভৃতির মতো বিভিন্ন সমস্যা ও বিপদ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গের গুরুত্বপূর্ন নদীগুলি যেমন তিস্তা, তোর্সা, জলঢাকা, মহানন্দা, দামোদর, শিলাবতী, দ্বারকেশ্বর, কংসাবতী প্রভৃতি দ্রুত পলি সঞ্চয়ের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য নদীর মতো রূপনারায়ণ নদী ও (একটি জোয়ারী নদী) বিশেষ করে এই নদীর নিম্নাংশ দ্রুত পলি সঞ্চয় এবং সেই সম্পর্কিত বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত সমস্যা ও বিপদের সম্মুখীন হচ্ছে। ঘাটালের কাছে বন্দর নামক স্থানে শিলাবতী ও দ্বারকেশ্বর নদী পরস্পরের সাথে মিলিত হয়েছে এবং যৌথ প্রবাহটি রূপনারায়ণ নদী নামে প্রায় ৭৮ কিলোমিটার প্রবাহিত হয়ে গেঁওখালীর কাছে হুগলি নদীতে এসে মিলিত হয়েছে। রূপনারায়ণ নদীর পুরো প্রবাহ (বন্দর থেকে গেঁওখালী পর্যন্ত) হুগলি নদীর জোয়ারের দ্বারা প্রভাবিত। নদীটির গঠন, প্রশস্ততা, জ্যামিতি এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে রূপনারায়ণ নদীর সম্পূর্ন গতিপথকে তিনটি অংশে বিভক্ত করা হয়েছে (মানচিত্র ১)। নদীর উচ্চ অংশটি বন্দর থেকে জসার পর্যন্ত প্রসারিত এবং প্রায় ২৮ কিলোমিটার দীর্ঘ। জসার এবং দেনান (কোলাঘাট) এর মধ্যবর্তী

সহকারী অধ্যাপক ও প্রধান, ভূগোল বিভাগ, নয়াগ্রাম পন্ডিত রঘুনাথ মুর্মু সরকারী মহাবিদ্যালয়, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিমবঙ্গ
ই-মেইল : swapan.maity55@gmail.com

অংশটি ১০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের এবং মধ্যবর্তী অংশ হিসাবে পরিচিত। নিম্ন অংশটি প্রায় ৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং কোলাঘাট থেকে গেঁওখালী পর্যন্ত প্রসারিত, যেখানে নদীটি হুগলী নদীর সাথে মিলিত হয়েছে।

পূর্ব গবেষণা :

রূপনারায়ণ নদীর পলি সঞ্চয় নিয়ে ১৯৬০ সালে সিনহা এবং বসু হারমোনিক পদ্ধতিতে একটি গাণিতিক মডেলের মাধ্যমে গবেষণা করেছিলেন। ১৯৬৮ সালে কলকাতা বন্দর কমিশনারের তত্ত্বাবধানে এই নদীর নিম্নাংশে একটি হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ পরিচালনা করা হয়। ১৯৬২-১৯৬৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জলসেচ ও জলপথ বিভাগ সমগ্র রূপনারায়ণ নদীর ওপর একটি প্রস্থচ্ছেদ জরিপ (cross-sectional survey) পরিচালনা করেছিলেন। ১৯৭০ সালে এই একই বিভাগ রূপনারায়ণ নদীর উর্ধাংশে (বন্দর থেকে জশার পর্যন্ত) ও একই জরিপকাজ পরিচালনা করেন। তাঁরা এই প্রস্থচ্ছেদ জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সমগ্র রূপনারায়ণ নদীর জন্য একটি গাণিতিক মডেল তৈরি করেছিলেন। সম্প্রতি, কলকাতা বন্দর (Kolkata Port Trust) এবং কোলাঘাট তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প (Kolaghat Thermal Power Project) যৌথভাবে রূপনারায়ণ নদীর নিম্নাংশে একটি ব্যাপক জরিপ পরিচালনা করেন।

ওপরের প্রতিটি গবেষনার কাজ মূলত সমগ্র রূপনারায়ণ নদীর, বিশেষকরে নদীর নিম্নাংশের (কোলাঘাট থেকে গেঁওখালী পর্যন্ত) নদীতে পলি সঞ্চয়ের পরিমান পরিমাপ, নদীখাতের গভীরতা, প্রশস্ততা, বিভিন্ন অংশের প্রস্থচ্ছেদ গুলির আকৃতি, জলপ্রবাহের ধরন, জলের গতিবেগ, জোয়ার-ভাঁটার প্রকৃতি ও ধরন প্রভৃতি (channel forms and patterns and stream hydraulics) বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়ে করা হয়েছে। নদীর নিম্নাংশে পলি সঞ্চয়ের প্রধান কারনগুলি কি কি বা কোন নিয়ন্ত্রক বিষয়গুলি পলি সঞ্চয়কে ত্বরান্বিত করছে, পলি সঞ্চয়ে নদীর প্রশস্তকরণ ও জলপ্রবাহ বিভাজনের কি ভূমিকা, জোয়ার-ভাঁটার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য পলি সঞ্চয়ে কি প্রভাব ফেলে, পলি সঞ্চয়ের পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়গুলি বিষদে আলোচনা করা হয়নি। তাই বর্তমান গবেষণায় রূপনারায়ণ নদীর নিম্নাংশে (কোলাঘাট থেকে গেঁওখালী পর্যন্ত) পলি সঞ্চয়ের কারণ এবং পদ্ধতিগুলি বোঝার এবং ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে, বিশেষ করে এই পলি সঞ্চয়ের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত সমস্যা এবং বিপদ সম্পর্কে বিশ্লেষণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

ক্ষেত্রসমীক্ষা অঞ্চলের স্থানিক অবস্থান :

রূপনারায়ণ নদীর নিম্নাংশটি (কোলাঘাট থেকে গেঁওখালী পর্যন্ত) ২২°১২′ উত্তর থেকে ২২°২৬′ উত্তর এবং ৮৭°৫৩′ পূর্ব থেকে ৮৮°০৩′ পূর্ব (মানচিত্র ১) অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ দ্বারা বেষ্টিত এবং সাধারণত গ্রীষ্মমন্ডলীয় মৌসুমি জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যযুক্ত, যেখানে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ১৩২০ মিমি থেকে ১৬৩০ মিমি এবং বার্ষিক তাপমাত্রা ৭°সে. থেকে ৪৫°সে. পর্যন্ত হয়। নদীর উপরের দিকের অংশটি খাড়া ঢাল থেকে মাঝারি খাড়া ঢাল যুক্ত হলে ও নিম্নাংশটি প্রায় মৃদু ঢাল যুক্ত অবস্থা থেকে সমতল প্রকৃতির (প্রতি কিমিতে <১০ মিটার)। নিম্নাংশের

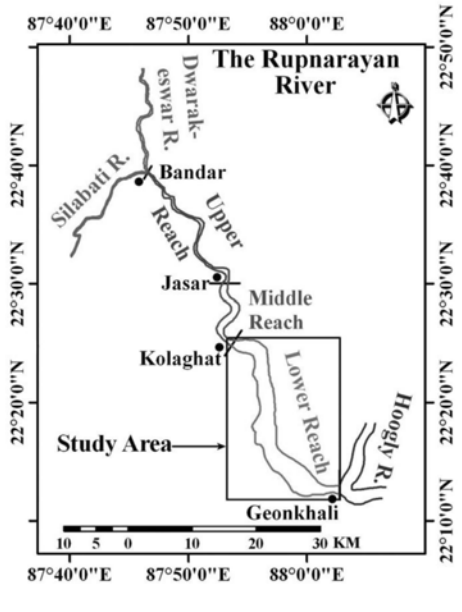

মানচিত্র ১: ক্ষেত্রসমীক্ষা অঞ্চলের অবস্থান

বেশিরভাগ এলাকা প্রায় ১০ মিটারের কম উচ্চতাযুক্ত (O'Malley 1995)। নিম্ন পলল সমভূমি এবং ব-দ্বীপীয় প্লাবন সমভূমি হল নদীর নিম্নাংশের প্রধান ভূ-রূপগত বৈশিষ্ট্য। অন্যদিকে নদীর উচ্চ অববাহিকাতে ঢেউখেলানো উচ্চ পলল সমভূমি, পাদদেশীয় সমভূমি, আন্তঃপাহাড়ী উপত্যকা এবং ব্যবচ্ছেদিত পাহাড়ি ঢালের উপস্থিতি ও আধিক্য লক্ষ্য করা যায় (Mukhopadhyay and Dasgupta, 2010)।

উপকরণ ও গবেষণা পদ্ধতি :

গবেষনার মূল উদ্দেশ্য পূরণের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি এবং কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে। বিভিন্ন যন্ত্র ব্যবহার করে ক্ষেত্রএলাকা পর্যবেক্ষণ থেকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় বিভিন্ন গৌন তথ্য এবং মানচিত্র বিভিন্ন প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত উৎস থেকে এবং সরকারি ও বেসরকারি অফিস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

১) সমগ্র গবেষণা এলাকাটি ডাম্পি লেভেল (Dumpy Level), ইকো-সাউন্ডার (Echo Sounder), জি.পি.এস. (GPS) প্রভৃতি ব্যবহার করে ব্যাথিমেট্রিক পদ্ধতিতে জরিপ করা হয়েছে। নদীর বিভিন্ন অংশের গভীরতা ইকো সাউন্ডারের সাহায্যে পরিমাপ করা হয়েছে। পলি সঞ্চয় এলাকা (shoal area) গুলির অবস্থান এবং তাদের ক্ষেত্রফল জিপিএস রিসিভার ব্যবহার করে নির্ধারণ ও পরিমাপ করা হয়েছে। পলি সঞ্চয় এলাকা এবং অন্যান্য স্থানের উচ্চতা ডাম্পি লেভেলের সাহায্যে মাপা হয়েছে।

২) রূপনারায়ণ নদীর নিম্নাংশে জোয়ার-ভাঁটার সময়ের জলের উচ্চতা বিভিন্ন গেজ স্টেশনে (কোলাঘাট, পায়রাটুঙ্গি, গেঁওখালি প্রভৃতি) প্রতি এক ঘন্টা অন্তর পরিমাপ করা হয়েছে। এছাড়া ও জোয়ার-ভাঁটার জলের উচ্চতার প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত তথ্য কোলাঘাট থার্মাল পাওয়ার স্টেশন ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জলসেচ ও জলপথ দপ্তরের অন্তর্ভুক্ত ঘাটাল ও তমলুকের আঞ্চলিক অফিস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

৩) নদীর নিম্নাংশের তলদেশের বিভিন্ন স্থানে ৫-৭ দিনের জন্য কাঠের ট্রে (১মি. অ ১মি.) রেখে পলি সঞ্চয়ের হার পরিমাপ করা হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাঠের ট্রে তে মোট পলি জমার পরিমাণ সতর্কতার সাথে পরিমাপ করা হয়েছে এবং প্রতি ঘণ্টায় পলি জমার হার নির্নয় করা হয়েছে।

৪) ন্যাশনাল রিমোট সেনসিং এজেন্সি (এন.আর.এস.এ) দ্বারা প্রস্তুত IRS LISS-III উপগ্রহচিত্র, SOI ভূবৈচিত্রসূচক মানচিত্র ও Landsat উপগ্রহচিত্র ব্যবহার করে পলি সঞ্চয়ের এলাকা চিহ্নিতকরন ও সেই সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় মানচিত্রগুলি প্রস্তুত করা হয়েছে।

৫) পলি সঞ্চয়ের সাথে সম্পর্কিত পূর্ববর্তী বিভিন্ন মানচিত্র, পলি সঞ্চয়ের এলাকার অবস্থান, পলি সঞ্চয়ের হার ও পরিমান সম্পর্কিত তথ্য, এলাকার ব্যাথিমেট্রিক বৈশিষ্ট্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য কোলাঘাট থার্মাল পাওয়ার প্রোজেক্ট এবং কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

রূপনারায়ণ নদীর নিম্নাংশে পলি সঞ্চয়ের কারণ এবং পদ্ধতি:

নদীর স্বাভাবিক কাজে যেকোনো ধরনের বাধা নদীর শক্তি হ্রাস করে এবং পলি ও জলের স্বাভাবিক প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করে যা নদীতে পলি সঞ্চয়কে উৎসাহিত করে। নদীতে শক্তির অভাবের কারণে পলি ও জল পরিবহন ক্ষমতা হ্রাস পাওয়া নদীর তলদেশে পলি সঞ্চয়ের মূল কারণ। নদীর প্রশস্তকরণের (channel widening) জন্য জলপ্রবাহের বিভাজন (flow separation) এবং জলের গতিবেগ হ্রাসের কারণে নদীতে শক্তির হ্রাস ঘটে, যা পলি সঞ্চয়কে ত্বরান্বিত করে। নদীর তলদেশে পলি সঞ্চয় প্রধানত নদীতে কতটা পরিমান শক্তি রয়েছে (available energy) এবং নদী মধ্যস্থিত পলি পরিবহনের জন্য কতটা পরিমান শক্তির প্রয়োজন (critical energy) তাদের মধ্যে সম্পর্কের উপর নির্ভর করে। যখন প্রয়োজনীয় শক্তির পরিমান, নদীতে বর্তমান থাকা শক্তির পরিমানের চেয়ে কম হয় তখন নদীতে পলি

সঞ্চিত হয়। আবার রূপনারায়ণ নদীর নিম্নাংশটি হুগলি নদীর জোয়ার-ভাঁটা দ্বারা প্রভাবিত হয় বলে, এই অংশের পলিসঞ্চয় ও জোয়ার-ভাঁটা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়।

নদীর প্রশস্তকরণ, জলপ্রবাহ বিভাজন, জলের গতিবেগ হ্রাস এবং পলিসঞ্চয়

কোলাঘাট অঞ্চলের কাছে নদীর প্রবাহপথের হঠাৎ প্রশস্তকরণ (channel widening) নদীর জলপ্রবাহের বিভাজন ও বিচ্যুতি (flow separation

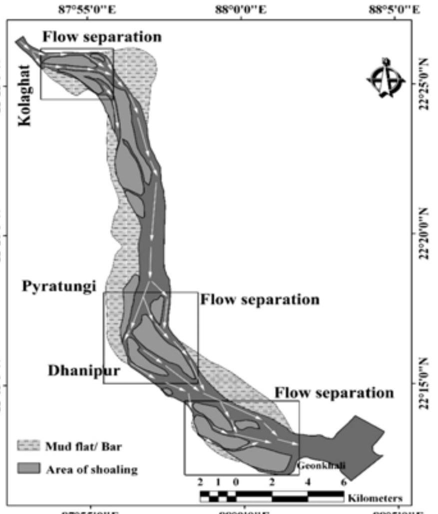

মানচিত্র ২: রূপনারায়ণ নদীর নিম্নাংশে জলপ্রবাহের বিভাজন (সূত্র: IRS LISS III উপগ্রহ চিত্র, উপগ্রহ চিত্র ও ক্ষেত্রএলাকা জরিপ)

and diversion) ঘটায় (মানচিত্র ২ এবং ৩ক)। এছাড়াও, পায়রাটুঙ্গি ও ধানীপুর এর মধ্যবর্তী এবং ধানীপুর ও গেঁওখালী এর মধ্যবর্তী এলাকাতে আরও দুটি জলপ্রবাহের বিভাজন রয়েছে (মানচিত্র ২ এবং ৩খ)। যেখানে নদী প্রশস্ত হয়, নদীপথের ঢাল হ্রাস পায় এবং জলপ্রবাহ কমে যায় সেখানেই নদীতে জলপ্রবাহের বিভাজন ও বিচ্যুতি লক্ষ্য করা যায়।

নদীর প্রশস্তকরণ এবং জলপ্রবাহের বিভাজন নদীতে জলের বেগ হ্রাস, নদীর শক্তি হ্রাস এবং পলি সঞ্চয়ের গুরুত্বপূর্ণ কারণ। গেঁওখালীর কাছে নদীর হঠাৎ সংকোচন (প্রস্থ-গভীরতা অনুপাত ১৩০.৪৩) ভাঁটার সময় জলের অবাধ নিষ্কাশনকে বাধা দেয়, যার ফলে জল জমে যাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে, নদীর গতিবেগ হ্রাস পায় এবং পলি নিষ্কাশনের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির হঠাৎ হ্রাস পায়।

জোয়ারের প্রসার এবং নদীবক্ষে পলিসঞ্চয়:

রূপনারায়ণ নদীতে, জোয়ারের প্রসার (উচ্চ এবং নিম্ন জোয়ারের জলের উচ্চতার পার্থক্য) নিম্ন প্রবাহ (গেঁওখালী) থেকে উচ্চ প্রবাহের (বন্দর) দিকে ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। গেঁওখালীর কাছে জোয়ারের প্রসার প্রায় ৪.১ মিটার, ধানীপুর এ ৩.৯ মিটার, পায়রাটুঙ্গিতে ৩.৩ মিটার এবং সোয়াদিঘিতে ৩.১ মিটার। দেনান (কোলাঘাট) এর কাছে জোয়ারের প্রসার কমে প্রায় ২.৯ মিটার হয়।

জোয়ারের সময় আন্তঃজোয়ার অঞ্চলের বিস্তার

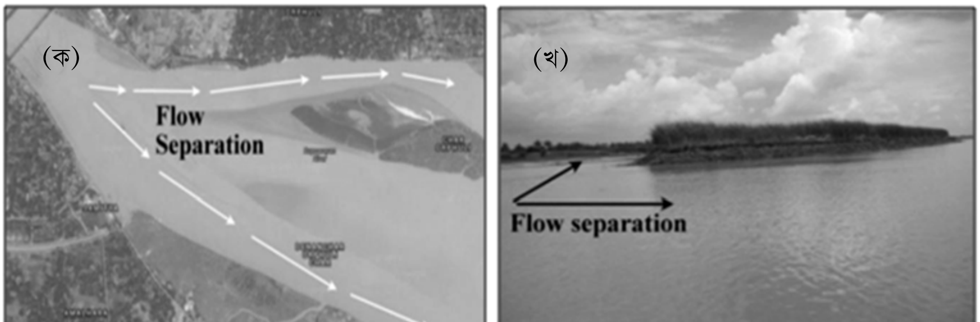

মানচিত্র ৩: কোলাঘাট (ক) এবং পাইরাটুঙ্গি (খ) -র কাছে জলপ্রবাহের বিভাজন

জোয়ারের প্রসারের ওপর নির্ভর করে (Pethick 1974)। জোয়ারের সময় নিম্ন প্রবাহের দিকে অবস্থিত আন্তঃজোয়ার অঞ্চলগুলি উচ্চ প্রবাহের দিকের অঞ্চলের তুলনায় বেশি জল এবং পলির যোগান পেয়ে থাকে। এই কারণেই উচ্চ প্রবাহের তুলনায় নিম্ন প্রবাহের দিকে পলি সঞ্চয়ের গড় হার বেশি। গেঁওখালীর কাছে পলি সঞ্চয়ের গড় হার প্রায় ২.৬৮ মিমি/ঘন্টা এবং ধানীপুরের কাছে তা প্রায় ৩.২১ মিমি/ঘন্টা। কিন্তু গোপীনাথপুরের কাছে এটি হ্রাস পেয়ে প্রায় ২.১৮ মিমি/ঘন্টা এবং কোলাঘাটের কাছে তা আর ও হ্রাস পেয়ে যায় (২.১৪ মিমি হয়।/ঘন্টা)

জোয়ার-ভাঁটার সময়ের অপ্রতিসমতা, জলের গতিবেগ, নদীর শক্তি এবং পলি সঞ্চয় :

রূপনারায়ণ নদীর নিম্নাংশে পলি সঞ্চয়ের হার বৃদ্ধির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল জোয়ার-ভাঁটার অপ্রতিসমতা (জোয়ার এবং ভাঁটার সময়কালের মধ্যে পার্থক্য)। জোয়ার-ভাঁটার অপ্রতিসমতা গেঁওখালীর কাছে প্রায় ২ ঘন্টা এবং ধানীপুরের কাছে তা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৩ ঘন্টা হয়। আবার, গোপীনাথপুরের কাছে তা ৪.৫ ঘন্টা, কোলাঘাটের কাছে প্রায় ৬ ঘন্টা এবং অবশেষে বন্দরের কাছে জোয়ার-ভাঁটার অপ্রতিসমতা বেড়ে হয় প্রায় ৬.৫-৭ ঘন্টা। জোয়ারের সময়, জল এবং পলি অতি অল্প সময়ের মধ্যে দ্রুত গতিতে নদীর অভ্যন্তরভাগের দিকে প্রবেশ করে কিন্তু ভাঁটার সময়, ঐ একই পরিমাণ জল এবং পলি নির্গত হতে দীর্ঘ সময় নেয়। ফলে, জোয়ারের সময় নদীতে জলের গতিবেগ, নদীতে শক্তির পরিমান ও নদীর পলি পরিবহন ক্ষমতা ভাটার সময়ের তুলনায় বেশী থাকে। ভাঁটার সময় নদীতে শক্তির পরিমান এবং নদীর পলি পরিবহন ক্ষমতা হ্রাসই নদীর তলদেশে পলি সঞ্চয়ের মুল কারন। তাই, রূপনারায়ণ নদীর নিম্নাংশে (হুগলি খাঁড়ির উপরের অংশ) পলির স্বাভাবিক নিষ্কাশন আটকে যাওয়ার ফলে নদীর তলদেশে পলি সঞ্চয়ের হার ত্বরান্বিত হয়।

রূপনারায়ণ নদীর নিম্নাংশ যেহেতু হুগলী খাঁড়ির বৈশিষ্ট্য দ্বারা প্রভাবিত তাই সর্ব্বোচ্চ জোয়ারের সময় যখন জলের গতিবেগ শূন্য হয়ে যায় তখন জোয়ারের জল মধ্যস্থিত সূক্ষ্ম পলিসমূহ নদীর তলদেশে জমা হয় (French 1997)। Rhodes (১৯৫০) এর মতে সমুদ্র ও খাঁড়ি অঞ্চলের লবণাক্ত জল যখন নদীর অভ্যন্তরভাগের দিকে প্রবেশ করে তখন নদীর মিষ্টি জল এই লবণাক্ত জলের সাথে মিলিত হলে নদীর জলের গতিবেগ কমে যায় এবং নদী বাহিত পলিসমূহ Stoke’s law অনুসারে নদীর তলদেশে জমা হতে থাকে। এই কারনে কোনো খাঁড়ির ওপরের দিকের অংশটি ক্রমাগত পলি সঞ্চয়ের ফলে ভরাট হতে থকে এবং পরবর্তীকালে এই অংশে পলির বন্টন প্রধানত নদীর মিষ্টি জল এবং সমুদ্র ও খাঁড়ি অঞ্চলের লবণাক্ত জলের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও তাদের শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় (Dyer 1973)।

মানচিত্র ৪-এ জোয়ারী নদীতে জোয়ার এবং ভাঁটার সময় জল ও পলি পরিবহন ক্ষমতার তারতম্য স্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে। এই চিত্রে, ‘Q’ বক্ররেখাটি জোয়ার এবং ভাঁটার সময় নদীতে জল পরিবহনের পরিমানকে নির্দেশ করে এবং ‘Q^m’ বক্ররেখাটি জোয়ার এবং ভাঁটার সময় নদীতে পলি পরিবহনের পরিমানকে নির্দেশ করে। জল পরিবহনের বক্ররেখার ক্ষেত্রে (‘Q’ বক্ররেখা), জোয়ারের সময়কাল ভাঁটার সময়কালের চেয়ে কম ($wy < y$) হলে ও বক্ররেখার ‘wxyw’ অংশের ক্ষেত্রফল (জোয়ারের সময়) এবং বক্ররেখার ‘yzdy’ অংশের ক্ষেত্রফল (ভাঁটার সময়) সমান। কিন্তু, পলি পরিবহনের বক্ররেখার ক্ষেত্রে (‘Q^m’ বক্ররেখা), জোয়ারের সময়কাল ভাঁটার সময়কালের চেয়ে কম ($wy < yz$) হলে ও বক্ররেখার ‘wxyw’ অংশের ক্ষেত্রফল (জোয়ারের সময়) বক্ররেখার ‘yzdy’ অংশের ক্ষেত্রফলের (ভাঁটার সময়) তুলনায় বেশী। অর্থাৎ, মানচিত্র ৪ নির্দেশ করে যে জোয়ারের সময়, রূপনারায়ন নদীর অভ্যন্তরভাগের দিকে বেশি পরিমাণে পলি প্রবেশ করে কিন্তু ভাঁটার সময় সমুদ্রের দিকে কম পরিমাণে পলি নিস্কাশিত হয়, যা স্পষ্ট ইঙ্গিত করে যে কিছু পরিমান পলি রূপনারায়ন নদীর নিম্নাংশের তলদেশে জমা হচ্ছে।

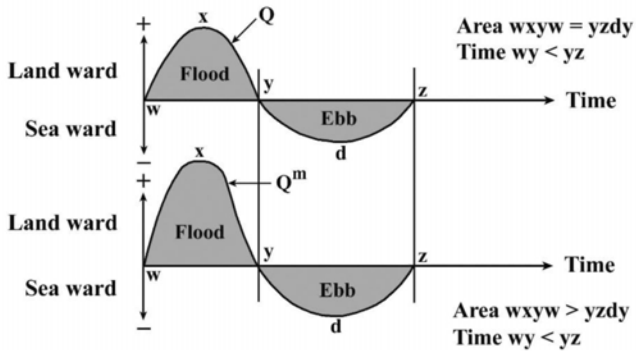

মানচিত্র ৪: জোয়ারী নদীতে জলের প্রবাহ এবং পলি পরিবহন ক্ষমতার মধ্যে সম্পর্ক

পলি সঞ্চয়ের বর্তমান অবস্থা :

বিগত কয়েক দশক ধরে রূপনারায়ণ নদীর নিম্নাংশে ক্রমাগত পলি সঞ্চয় এবং চর এলাকার সৃষ্টি ও বিস্তারের ফলে নদীর জল পরিবহন ক্ষমতা অনেকটা কমে গেছে। গত ৩০ বছরে এই অঞ্চলে প্রায় ৪৯.৭৪ মিলিয়ন ঘনমিটার পলি সঞ্চিত হয়েছে এবং ১৭.২৯ মিলিয়ন ঘনমিটার এলাকা ক্ষয় পেয়েছে। অর্থাৎ, প্রায় ৩২.৪৫ মিলিয়ন ঘনমিটার এলাকায় পলি পলি সঞ্চয় বৃদ্ধি পেয়েছে (সারণী ১)। কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের পরিমাপ এবং সরাসরি ক্ষেত্র জরিপ থেকে দেখা গেছে যে ১৯৭৩ সালে মোট পলি সঞ্চিত এলাকা ছিল প্রায় ১৫.৪১ বর্গকিলোমিটার, ১৯৯০ সালে তা বেড়ে হয় ৪৩.৪৩ বর্গকিলোমিটার, ২০০০ সালে পুনরায় তা বেড়ে হয় ৪৬.১৫ বর্গকিলোমিটার এবং ২০২০) সালে মোট পলি সঞ্চিত এলাকা বেড়ে প্রায় ৫৯.৬৩ বর্গকিলোমিটার হয়েছে (সারণী ২ এবং মানচিত্র ৫)।

রূপনারায়ন নদীর নিম্নাংশের বিভিন্ন স্থানে পলি সঞ্চয়ের হার বিভিন্ন এবং শুষ্ক ঋতুতে (প্রাক-বর্ষা এবং বর্ষা-পরবর্তী) পলি সঞ্চয়ের হার বর্ষা ঋতুর তুলনায় বেশি (সারণী ৩)। নদীতে জলের প্রবাহ ও গতিবেগ, শক্তির পরিমান, নদীর তলদেশের ঢালের পরিবর্তন, পলির পুনর্বণ্টন প্রভৃতির সাথে সামঞ্জস্য রাখতে চর এলাকাগুলির অবস্থান ও ক্ষেত্রফল পরিবর্তিত হয়। পলি সঞ্চিত এলাকার ক্ষেত্রফলের পরিবর্তন বোঝার জন্য ভূ-প্রাকৃতিক মানচিত্র (Survey

সারণী ১: রূপনারায়ন নদীর বিভিন্ন অংশে পলির সঞ্চয় ও ক্ষয়ের পরিমান

উপঅংশ	দৈর্ঘ্য (কিমি)	মোট সঞ্চয় (মিলিয়ন ঘনমিটার)	মোট ক্ষয় (মিলিয়ন ঘনমিটার)	মোট সঞ্চয় বৃদ্ধি (মিলিয়ন ঘনমিটার)
গেঁওখালী থেকে ধানীপুর	১০	১৩.২৮	৩.৯৭	৯.৩১
ধানীপুর থেকে অনন্তপুর	১২	২১.৪৫	৫.২২	১৬.২৩
অনন্তপুর থেকে গোপীনাথপুর	১০	৬.৩৯	৩.৬৪	২.৭৫
গোপীনাথপুর থেকে দেনান	৮	৮.৬২	৪.৪৬	৪.১৬
মোট	৪০	৪৯.৭৪	১৭.২৯	৩২.৪৫

(সূত্র: কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প)

সারণী ২: পলিসঞ্চয় (চর) এলাকার সম্প্রসারণ

সময়	চর এলাকার সংখ্যা	চর এলাকার ক্ষেত্রফল (বর্গকিলোমিটার)
১৯৭৩	১৬	১৫.৪১
১৯৯০	২১	৪৩.৪৩
২০০০	১৭	৪৬.১৫
২০২০	২২	৫৯.৬৩

সূত্র : IRS LISS-III উপগ্রহ চিত্র এবং Landsat উপগ্রহ চিত্র, টপোগ্রাফিক্যাল মানচিত্র [১৯৭৩, ১৯৯০,২০০০, ২০২০] এবং ক্ষেত্র এলাকা জরিপ [২০২০]

of India), IRS LISS-III উপগ্রহ চিত্র এবং Landsat উপগ্রহ চিত্র ব্যবহার করা হয়েছে।

রূপনারায়ন নদীর নিম্নাংশে পলি সঞ্চয়ের সমস্যা:

ক্রমাগত পলি সঞ্চয়ের ফলে রূপনারায়ণ নদীর নিম্নাংশের বহন ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় শিলাবতী, দ্বারকেশ্বর, কংসাবতী এবং অন্যান্য নদী পরিবাহিত বিপুল পরিমাণ জলরাশির স্বাভাবিক নিষ্কাশন বাধাপ্রাপ্ত হয় যা আবার হুগলী নদীর জল ও পলি পরিবহনের ওপর কিছুটা বিরূপ প্রভাব ফেলে। ক্রমবর্ধমান পলি সঞ্চয় ও চর এলাকার সৃষ্টি ও বিস্তার বিভিন্ন প্রকার আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত সমস্যার সৃষ্টি করে, যেমন প্রয়োজনীয় মিষ্টি জলের অভাব, ঘন ঘন বন্যা, নৌ-চলাচল সমস্যা, নদীপাড় ভাঙন এবং বসতি ও সম্পত্তি নষ্ট প্রভৃতি।

মিষ্টি জলের যোগানে ঘাটতি :

দ্রুত এবং ক্রমাগত পলি সঞ্চয়ের ফলে রূপনারায়ণ নদীর নিম্নাংশের নদী তলদেশের উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়েছে যার ফলে কৃষি, শিল্প, কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প প্রভৃতি বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় মিষ্টি জলের প্রাপ্যতার অভাব দেখা যাচ্ছে। শুষ্ক ঋতুতে যখন বৃষ্টির জলের যোগান খুব কম থাকে তখন এই সমস্যা তীব্র এবং গুরুতর হয়ে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ, কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র (KTPS), বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত জল ইনটেক পাম্প হাউসের মাধ্যমে রূপনারায়ণ নদী থেকে তোলে। কিন্তু বিগত কয়েক বছর ধরে পাম্প হাউসের ডলফিন মুখের চারপাশে দ্রুত পলি সঞ্চয় এবং চর এলাকার সম্প্রসারণের কারণে, বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি পর্যাপ্ত জল সরবরাহের ঘাটতির সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে

সারণী ৩: পলি সঞ্চয়ের হারের দৈশিক ও সময়গত পার্থক্য

পলি সঞ্চয়ের হার মিমি/ঘন্টা)					
স্থান	গেঁওখালী	ধানীপুর	অনন্তপুর	গোপীনাথপুর	দেনান / কোলাঘাট
প্রাক-বর্ষা	২.৮৪	৩.১২	২.৫৬	২.২২	২.৩৬
বর্ষাকাল	২.১৪	২.৯৮	১.২৯	১.৫৪	১.৮১
বর্ষা-পরবর্তী	৩.০৫	৩.৫৪	২.৩৭	২.৬৬	৩.১৮

(সূত্র: ক্ষেত্র এলাকা জরিপ)

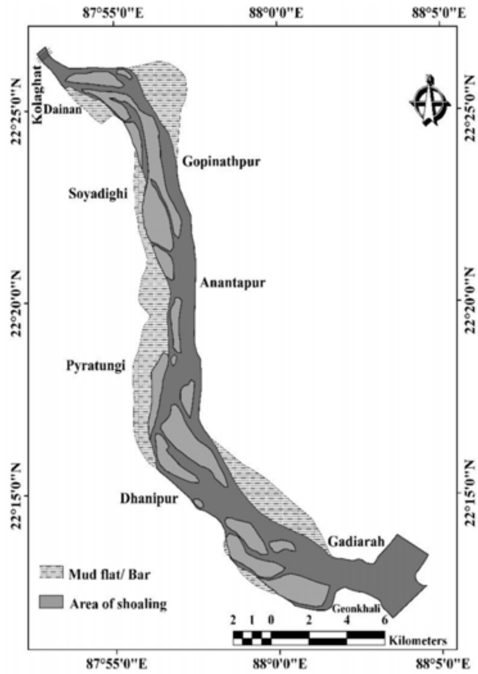

মানচিত্র ৫: বর্তমানে রূপনারায়ণ নদীর নিম্নাংশে চর এলাকার অবস্থান (সূত্র: IRS LISS-III উপগ্রহ চিত্র, Landsat উপগ্রহ চিত্র এবং ক্ষেত্র এলাকা জরিপ)

(মানচিত্র ৬ক)। ফলস্বরূপ, জলের অপ্রতুলতার কারণে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে, বিশেষ করে শুষ্ক ঋতুর (মার্চ থেকে মে) নিম্নজোয়ার বা ভাঁটার সময় এই সমস্যা প্রকট হয়।

বন্যার প্রবনতা ও প্রকোপ বৃদ্ধি :

শিলাবতী-দ্বারকেশ্বর-কংসাবতী-দামোদর নদী প্রণালী এবং উচ্চ প্রবাহের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উপনদীগুলির সম্পূর্ণ জল রূপনারায়ণ নদীর মধ্য দিয়ে নিষ্কাশিত হয়। কিন্তু, ক্রমাগত পলি সঞ্চয় ও চর এলাকার সৃষ্টির ফলে রূপনারায়ণ নদীর তলদেশের উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে, উক্ত নদীগুলির বিপুল পরিমাণ জলের অবাধ নিষ্কাশন বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে যার ফলে জল জমে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়ে এই নদীগুলির নিম্নাংশে বন্যার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাসপুর (১ ও ২), ঘাটাল, চন্দ্রকোনা (১ ও ২), কেশপুর প্রভৃতি ব্লকগুলি শিলাবতী নদীর বন্যার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে (মানচিত্র ৬খ)। কংসাবতী নদীর বন্যা দাসপুর-২ ব্লকের মানুষদেরও প্রভাবিত করে। হুগলী জেলার আরামবাগ ব্লক ও ঘন ঘন বন্যার বিপর্যয় দ্বারা প্রভাবিত হয়। উচ্চ প্রবাহের এই সমস্ত নদীগুলির নিম্নাংশে জল জমে যাওয়া এবং ফলস্বরূপ বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি মূলত বর্ষাকালে প্রবল হয়। কারণ এই সময় ভূপৃষ্ঠস্থ বিপুল পরিমান জলরাশির অবাধ নিষ্কাশন বাধাপ্রাপ্ত হয়।

নৌ-চলাচলের সমস্যা :

নদীর তলদেশে ক্রমাগত পলি সঞ্চয়ের ফলে নদীটি নৌ-চলাচলের অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে। নদীর

মানচিত্র ৬: কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ইনটেক পাম্প হাউসের কাছে জলের ঘাটতি (ক) এবং ঘাটাল এলাকায় বন্যার সমস্যা (খ)। (সূত্র : ক্ষেত্রচিত্র সংগ্রহ)

তলদেশে বিপুল পলিরাশির সঞ্চয় এবং নদীর গভীরতা হ্রাসের কারণে রূপনারায়ণ নদীর নিম্ন প্রবাহ তার স্বাভাবিক বহন ক্ষমতা হারিয়ে নৌ-চলাচলের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। জলের প্রয়োজনীয় গভীরতার অভাবে নৌকা ও অন্যান্য নৌ-যান নদীর ওপর দিয়ে সহজে চলাচল করতে পারে না। এই সমস্যাটি কিছু কিছু জায়গায় এতটাই তীব্র যে জাহাজ বা নৌকা গুলিকে নদীর পাড় থেকে ১ কিলোমিটারেরও বেশি দূরে থামতে হয় এবং মানুষকে নদীর পাড়ে পৌঁছানোর জন্য নদীর ওপর দিয়ে দীর্ঘ দূরত্ব হেঁটে যেতে হয় (মানচিত্র ৭ক)।

নদীর পাড়ের ভাঙন এবং সম্পত্তি ও জনবসতি ধ্বংস:

নদীর পাড়ের ভাঙন, জনবসতি ধ্বংস, সম্পত্তি নষ্ট প্রভৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল নদীর তলদেশে পলি সঞ্চয়। নদীর কোনো এক পাড়ের দিকে ক্রমাগত পলি সঞ্চয় এবং নদীর তলদেশের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে নদীর মূল গতিপথ এবং গভীরতম অংশটি অন্য পাড়ের দিকে সরে যায়। ফলে যে পাড়ের দিকে নদীর মূল গতিপথ সরে যায় সেদিকে জলের যোগান বাড়ে এবং জলের অতিরিক্ত চাপে ঐ পাড়ে ভাঙন সৃষ্টি হয় এবং জনবসতি ও সম্পত্তির ক্ষতি হয়। বর্ষাকালে পাড় ভাঙন এবং সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলির প্রভাব তীব্র হয়ে ওঠে কারণ ঐ সময় স্থলভাগ থেকে প্রচুর পরিমাণে জল নিষ্কাশিত হয়ে নদীতে জলের পরিমাণ বৃদ্ধি করে এবং নদীর পাড়ে প্রচণ্ড চাপ তৈরি করে। কয়েক বছর আগে, তমলুক এবং কোলাঘাট (মানচিত্র ৭খ) অঞ্চলে বিশাল নদীপাড় ভাঙনের ঘটনা ঘটে এবং যার ফলে সেখানকার জনবসতি এবং সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষতি হয়।

উপসংহার:

বর্তমানে, নদীগর্ভে ক্রমাগত এবং দ্রুত পলি সঞ্চিত হওয়া সারা বিশ্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। অতীত থেকে এই সমস্যা চলে আসছে এবং আঞ্চলিক স্তর থেকে বিশ্বস্তর পর্যন্ত এর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। বিশ্বের বেশিরভাগ দেশেই নদীতে পলি সঞ্চয়ের বিভিন্ন সমস্যা যেমন নদীর বহন ক্ষমতা হ্রাস এবং এর বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি, নদীর পাড় ভাঙন, সম্পদ ও প্রাণহানি প্রভৃতির সম্মুখীন হচ্ছে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রধান ও আঞ্চলিক নদীগুলির উপর বিজ্ঞানী এবং গবেষকদের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে নদীগর্ভে পলি সঞ্চয়ের হার এবং এর সাথে সম্পর্কিত সমস্যাগুলি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানুষের বিভিন্ন ধরনের কার্যাবলী যেমন কৃষি, শিল্প এবং অন্যান্য নির্মাণ ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পলি সঞ্চয়ের হারকে বাড়িয়ে তুলেছে এবং এর ফলে আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত সমস্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মানচিত্র ৭: নদীতে নৌচলাচলের সমস্যা (ক) এবং নদী পাড় ভাঙনের কারণে জনবসতির ক্ষতি (খ)

তথ্যসূত্র:

1. Dyer, K, (1973), 'Estuaries : a physical introduction', John Wiley and Sons, London.
2. French, W. P., (1997), 'Coastal and estuarine management', Routledge Environmental Management Series, Routledge Publication, London, pp-1-219.
3. Mukhopadhyay, S. C.— and Dasgupta, A, (2010), River Dynamics of West Bengal, Physical Aspects, I, pp-1-220.
4. O'Malley, L.S.S., (1995), Physical Aspects, Bengal District Gazetteers, Midnapore, Published by West Bengal District Gazetteers, Pp-1-141.
5. Pethick,J. S., (1974), The distribution of salt pans on tidal salt marshes, J Biogeog 1, pp-57-62.
6. Rhodes, R. F., (1950), Effects of salinity on current velocities, US Corps of Engineers, Committees Tidal Hydraulics. report No-1, pp-94.

ভূগোল খবর

পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে সাম্প্রতিক ভূমিকম্প কীসের ইঙ্গিত?

পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে গত এক সপ্তাহে বেশ কয়েকবার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। এর মাঝে ২৬শে নভেম্বর বুধবার রাতে বঙ্গোপসাগরে চার মাত্রার একটি ভূমিকম্প হয়েছে। ২৭শে নভেম্বর ছয় দশমিক ছয় মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছে ইন্দোনেশিয়ায়। এর কারণে বড় কোনো সুনামির খবর পাওয়া যায়নি। তবে ইন্দোনেশিয়ায় অথবা আন্দামান নিকোবর দ্বীপের দিকে বড় ভূমিকম্প হলে ভারত ও বাংলাদেশেও সুনামির ঝুঁকি রয়েছে, বলছেন বিশেষজ্ঞরা। এর কারণ হল আমাদের পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠ বিভিন্ন চলনশীল প্লেটে ভাগ করা। কোথাও পাত একে অপরকে ঠেলে দেয়, কোথাও পাশ কাটিয়ে যায়, আবার কোথাও নিচে ঢুকে যায়। এমন ক্ষেত্রে যেমন ভূমিকম্প হয়, তেমন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত থেকেও ভূপৃষ্ঠে কম্পন সৃষ্টি হতে পারে। এটি মাটির উপরে বা জলের নিচে যে কোনো জায়গায় হতে পারে। ২৩ কোটি থেকে ২৮ কোটি বছর আগেও পৃথিবীর সব মহাদেশ মিলে এরকম একক ভূখণ্ড ছিল প্যানজিয়া। টেকটনিক প্লেটের ক্রমাগত অবস্থান পরিবর্তন থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে অনেকগুলো ভূখণ্ড হয়েছিল এবং তারা এখনও সক্রিয়ভাবে ভাঙাগড়ার চালিয়ে যাচ্ছে।

তাই ভূমিকম্প প্রবণ এলাকার ব্যাপক পরিবর্তন হচ্ছে ভারতে। দেশের ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা কোনগুলি তা চিহ্নিত করে সংশোধিত একটি মানচিত্র প্রকাশ করল ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস। বর্তমানে ভারতের ৬১% অংশ এখন মাঝারি থেকে উচ্চ ভূমিকম্প প্রবণ এলাকায় পড়ছে।

নতুন মানচিত্রে ভারতকে মোট পাঁচটি জোনে ভাগ করা হয়েছে। তবে কোন জোন কতটা ভূমিকম্পপ্রবণ তা বোঝাতে ২ থেকে ৬ পর্যন্ত ক্যাটাগরি ব্যবহার করা হয়েছে। হালকা কমলা রঙের জোন চার ক্যাটাগরিতে রাখা হয়েছে কলকাতাকে। সর্বোচ্চ ভূমিকম্প প্রবণ অর্থাৎ লাল রঙের জোন ছয় ক্যাটাগরিতে রয়েছে সিকিমের গ্যাংটক, জম্মু-কাশ্মীরের একাংশ, দেরাদুন এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের সবক'টি রাজ্য। হিমালয় ফ্রন্টাল থ্রাস্ট ধরে সম্ভাব্য ভূকম্পনের বিস্তার দক্ষিণে নেমে গিয়ে পৌঁছতে পারে দিল্লির মতো এলাকায়। তাই দেরাদুন-সহ আউটার হিমালয়ের বড় অংশও উচ্চ ঝুঁকিতে ফেলে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও রেড জোনে রয়েছে আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ।

হিমালয়ের দক্ষিণ দিকে ভূমিকম্পের প্রবণতা সবচেয়ে বেশি হিসাবে দেখানো হয়েছে মানচিত্রটিতে। পৃথিবীর সবচেয়ে সক্রিয় টেকটনিক সংঘর্ষ সীমানায় হিমালয়ের অবস্থান। ভারতীয় প্লেট প্রতি বছর ইউরেশীয় প্লেটে পাঁচ সেন্টিমিটার গতিতে উত্তরদিকে ধাক্কা মারছে। সেই অভিঘাতেই তৈরি হচ্ছে ভূমিকম্প। দু'টি ভিন্ন জোনের সংযোগস্থলে থাকা ভারতের শহরগুলিকেও এখন হাই রিস্ক জোনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সেই জায়গাগুলি হল উত্তরপ্রদেশ, হিমাচলপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ডের মতো রাজ্যের ঘনবসতিপূর্ণ শহর। কলকাতা এখন ভূমিকম্প বিপর্যজ্জনকতার দিক থেকে যেকোনো সময় বড় ক্ষতির মুখে পড়তে পারে। প্রতিনিয়ত পরিকল্পনাহীন বহুতল নির্মাণ ও ভৌমজল উত্তোলন আরও বড় বিপদ ডেকে নিয়ে আসতে পারে।

ভূগোল স্বদেশ চর্চা
21th Year, 2nd Volume July-December '25
Registration No : Wbben/2007 / 21524 ● ISSN 2581-4788

পান পাতা ঃ ভারতের উপেক্ষিত সবুজ সোনা, একটি পর্যালোচনা

দেবব্রত চন্দ

সংক্ষিপ্তসার :

পান গাছ চির সবুজ, বহুবর্ষজীবি বিরুৎ কিন্তু মূলারোহী রোহিনী জাতীয় একটি উদ্ভিদ, যা ক্রান্তীয় এবং উপক্রান্তীয় অঞ্চলে চাষ করা হয়। প্রাচীনকাল থেকেই পান ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ঐতিহ্যগতভাবে এটি সুপারি ও চুনের সাথে চিবানোর জন্য ব্যবহৃত হলেও, পান পাতার ঔষধিগুণ, অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল বৈশিষ্ট্য এবং পুষ্টিগুণের জন্যও তা সুপরিচিত। ভারতে পানচাষ পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, কেরালা, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, অসম, বিহার এবং ওড়িশা রাজ্যের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল। পান পাতার চাষ একটি শ্রমনিবিড় কাজ, যা কৃষি শ্রমিকদের জন্য নিয়মিত কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে এবং তাদের পরিবারকে সহায়তা করতে পারে। জাতীয় কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে, পানের পাতা উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, পরিবহন ও বিপণনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ২৫-৩০ লক্ষ পরিবার ২ কোটি মানুষ যুক্ত রয়েছেন। ভারতে এই পান চাষ থেকে প্রতি বছর প্রায় ৬০০ থেকে ৭০০ কোটি টাকার উপার্জন অর্জিত হয়, যা জাতীয় অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই কারণেই এটিকে 'ভারতের সবুজ সোনা' বলা হয়। পান পাতার চাষ লাভজনক হলেও কিছুটা ঝুঁকিপূর্ণ, কারন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রোগপোকার উপদ্রব, অধিক পচনশীলতা এবং সংগঠিত বাজার ব্যবস্থার অভাব এই চাষের বাণিজ্যিকীকরন ও বিস্তারে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই গবেষণাপত্রে পান চাষের জন্য নির্ধারিত এলাকা এবং উৎপাদন, কৃষিতত্ত্ব ও কৃষি-অর্থনীতি, গুণাবলী এবং জাতীয় অর্থনীতিতে এর ভূমিকা প্রসঙ্গে একটি আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে।

সূচক শব্দ ঃ *পান পাতা, প্রজাতি, কৃষিতত্ত্ব ও কৃষি-অর্থনীতি, ঔষধি ও পুষ্টিগুণ, জাতীয় অর্থনীতি।*

ভূমিকা ঃ

ভারতবর্ষের প্রাচীন সমাজ জীবনে, এমনকি রাজকীয় সংস্কৃতিতেও তাম্বুল বা পানের উল্লেখ রয়েছে যার নিদর্শন পাওয়া যায় কালিদাসের সাহিত্যকীর্তিতেও। ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতিতে পান চাষের ভূমিকা আজও বিশেষভাবে অর্থবহ এবং তাৎপর্যপূর্ণ। পাইপার বিটল বা পান একটি চিরসবুজ লতা যা প্রাচীনকাল থেকে চাষের জন্য ব্যবহৃত হয়ে এলেও তবে সাম্প্রতিক সময়ে এটি ভারতীয় বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে বিশাল গুরুত্ব অর্জন করেছে। পান পাতা এর উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত থাকলেও, অধিকাংশ গবেষক মালয়েশিয়াকে এর আদি দেশ হিসেবে মনে করেন। পাইপার বিটল কেন্দ্রীয় এবং পূর্ব মালয়েশিয়া থেকে উদ্ভূত এবং ২৫০০ বছরেরও বেশি আগে মালয়েশিয়া এবং এশিয়ার উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলে চাষে গৃহীত হয়েছিল (Ahuja, ২০১১)। ভৌগোলিকভাবে পান চাষের এলাকা ও বিস্তার ৬৮° পূর্ব থেকে ১৭৮° পূর্ব দ্রাঘিমাংশ এবং ১২° দক্ষিণ থেকে ৩০° উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

ভারতীয় উপমহাদেশে প্রধান হিন্দিতে 'পান', সংস্কৃতিতে 'তাম্বুল', কান্নাডাতে 'বিলায়াদেলা', মালয়ালামে 'ভেটিলাক্কোটি', তামিলে 'বিত্তিলাই', তেলুগুতে 'তামালাপাকু', মারাঠিতে 'ভিডেচে-পান', গুজরাটিতে 'নগরবেল' এবং বাংলায় 'পান পাতা' নামে পরিচিত। বিদেশি ভাষায় এটি আরবিতে 'তাম্বুল' এবং ফার্সিতে 'বুর্গ-ই-তানবোল' নামে পরিচিত। প্রাচীন আয়ুর্বেদ গ্রন্থ যেমন চরক, সুশ্রুত সংহিতা এবং কাশ্যপ ভোজনকাল্পা অনুযায়ী, খাবারের পরে পান পাতা চিবানোর অভ্যাস ৭৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৩০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে জনপ্রিয় হয়েছিল (Prakash, ১৯৬১)। পান পাতা ভিটামিন বি এবং

সহকারী অধ্যাপক, ভূগোল বিভাগ, আশুতোষ কলেজ, কলকাতা
ই-মেইল : **dchanda34@gmail.com**

সি তে সমৃদ্ধ এবং এটি মস্তিষ্ক, যকৃৎ এবং হৃদয়ের জন্য একটি টনিক হিসেবে বিবেচিত হয়। এটি মুখ এবং গলা পরিষ্কার করে এবং লবণ দিয়ে চিবানোর ফলে অতিরিক্ত অ্যাসিড নিরপেক্ষ করে পাচন সাহায্য করে (Kaintura et al., ২০২০)।

ভারতে, যদিও এটি অনেক আগে থেকেই চাষ করা হচ্ছে, তবু এর বাণিজ্যিক গুরুত্ব গত ২০ থেকে ২৫ বছরে অনুভূত হয়েছে। পান পাতার চাষ খুবই শ্রমনিবিড় এবং বিশেষ করে ছোট খামারের জন্য উপযুক্ত। একবার ফসল স্থাপন হলে, এটি চিরস্থায়ী কর্মসংস্থান এবং কৃষকদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয়তার জন্য নগদ প্রবাহের উৎস হয়ে ওঠে (Maiti and Shivashankara, ১৯৯৮)। পানপাতা বরোজে ছয় মাসেরও বেশি সময় ধরে নষ্ট না হয়ে থাকতে পারে বলে, এটি আমাদের দেশের জন্য অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাজারে একটি সর্বদা-প্রতিশ্রুতিশীল বাণিজ্যিক উপকরণ হয়ে উঠেছে। একটি পরিবার, যার সদস্য সংখ্যা চার থেকে পাঁচ জন (শিশুদের সহ) ধারণা করা হয় যে, ৮-১০ কাঠা জমিতে পানের বরোজ পরিচালনা করলে তারা জীবিকা নির্বাহ করতে সক্ষম হবে (Chattopadhyay, ২০০১)।

ভারতীয় পান পাতার যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ইউএই, কানাডা, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা এবং থাইল্যান্ডে প্রচুর চাহিদা রয়েছে যেখানে স্থানীয় সরবরাহ চাহিদার তুলনায় অনেক কম। ফলে, প্রতি বছর প্রায় ৩-৪ কোটি টাকা মূল্যের পান পাতা ইউরোপীয় দেশগুলিতে রপ্তানি করা হয় (Guha, ২০০৬)। পান পাতার চমৎকার রপ্তানি সম্ভাবনা রয়েছে যা আমাদের দেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের ক্ষেত্রে অবদান রাখে।

পূর্ববর্তী গবেষণা ঃ

পূর্ববর্তী গবেষণাগুলোতে Piper betle L. বা পানের লতা সম্পর্কিত উদ্ভিদবিদ্যা, চাষ পদ্ধতি, রাসায়নিক উপাদান, ঔষধি গুণ এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক গুরুত্বের বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হয়েছে। প্রাথমিক গবেষণায় নির্দেশিত হয়েছে যে, ভারতে পানের শতাধিক প্রজাতি বিদ্যমান, যাদের পাতার আকার, গন্ধ, স্বাদ ও রাসায়নিক গঠনে উল্লেখযোগ্য বৈচিত্র্য রয়েছে। কৃষি গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, পান আর্দ্র ও উষ্ণ জলবায়ু, উর্বর এবং জল নিষ্কাশনযোগ্য মাটিতে, আংশিক ছায়া ও পর্যাপ্ত সেচের ব্যবস্থায় সর্বোত্তমভাবে বৃদ্ধি পায়। আধুনিক কৃষিতে কলম বা কাটিং দ্বারা বংশবিস্তার, জৈব সার ও বায়োফার্টিলাইজারের প্রয়োগ, এবং সঠিক পুষ্টি ব্যবস্থাপনা পানের ফলন ও পাতার গুণমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এছাড়া, Phytophthora এবং Colletotrichum প্রজাতির ছত্রাকজনিত রোগ, নেমাটোড আক্রমণ এবং উইল্ট সমস্যা নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত রোগ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা গবেষণায় উল্লিখিত হয়েছে।

ফাইটোকেমিক্যাল গবেষণায় জানা গেছে যে, পানের পাতা বিভিন্ন ধরনের উদ্বায়ী তেল ও জৈব যৌগে সমৃদ্ধ। প্রধান উপাদানসমূহ হলো চাভিকল, ইউজেনল, হাইড্রক্সিচাভিকল এবং সাফরল, যা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল, অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি এবং অ্যান্টিকার্সিনোজেনিক গুণাবলীর জন্য সুপরিচিত। ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসাবিদ্যায় পানের ব্যবহার হজমশক্তি বৃদ্ধি, মুখের জীবাণু দমন, শ্বাসযন্ত্রের সমস্যা হ্রাস এবং ক্ষত নিরাময়ে কার্যকর হিসেবে দীর্ঘকাল ধরে স্বীকৃত। সাম্প্রতিক গবেষণায় বায়োটেকনোলজির মাধ্যমে পানের মাইক্রোপ্রপাগেশন, জেনেটিক বৈচিত্র্য বিশ্লেষণ এবং পাতা থেকে এসেনশিয়াল অয়েল নিষ্কাশনের নতুন প্রযুক্তি উন্নয়নে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অর্থনৈতিকভাবে, পান ভারতের বহু ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের জীবিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। পশ্চিমবঙ্গ, ওডিশা, অসম, তামিলনাড়ু এবং অন্ধ্রপ্রদেশে পানের চাষ লাভজনক হলেও বিপণন ব্যবস্থার দুর্বলতা, পরিবহন সমস্যা, সংরক্ষণ সুবিধার অভাব এবং পাতার দ্রুত পচনশীলতা এর সম্প্রসারণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। সাম্প্রতিক গবেষণায় এসব সমস্যার সমাধানে, ফসল সংগ্রহের উন্নত পদ্ধতি, সংরক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত হিমঘরের ব্যবস্থা এবং পানের পাতা থেকে তেল, নির্যাস ও ভেষজ পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা উল্লেখ করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে, পূর্ববর্তী

গবেষণাগুলো পানের বহুমুখী ব্যবহার, কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে এর সম্ভাবনা, এবং গ্রামীণ জীবিকায় এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করেছে। এই তথ্যগুলি প্রমাণ করে যে পান সত্যিই ভারতের একটি 'সবুজ সোনা' যার সঠিক ব্যবস্থাপনা ও গবেষণার মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি ও স্বাস্থ্য উভয় ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনা উন্মোচিত হতে পারে।

তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণা পদ্ধতি ঃ

এই পর্যালোচনামূলক প্রবন্ধটি পানের লতা (Piper betle L.)-এর চাষাবাদ, প্রক্রিয়াকরণ, রাসায়নিক উপাদান এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কিত পূর্বপ্রকাশিত গবেষণা ও দ্বিতীয়ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে পর্যালোচিত জার্নাল, সরকারি প্রতিবেদন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা এবং অনলাইন গবেষণা ডেটাবেস যেমন- Scopus, Science Direct, Research Gate এবং Google Scholar থেকে। এছাড়াও, Directorate of Arecanut and Spices Development (DASD), National Horticulture Board (NHB) এবং দেশের বিভিন্ন রাজ্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিবেদন থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। যেখানে পানের চাষপদ্ধতি, জাতভেদ, রোগ ও পোকা ব্যবস্থাপনা, পোস্ট-হার্ভেস্ট প্রযুক্তি, এসেনশিয়াল অয়েল নিষ্কাশন পদ্ধতি এবং ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাজার প্রবণতা সম্পর্কিত তথ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ফসলের অনলাইন বাণিজ্য সম্পর্কিত তথ্য eNAM (National Agriculture Market) প্ল্যাটফর্ম থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে, যা ভারতের কৃষি পণ্যের বাজারমূল্য, লেনদেন এবং সাম্প্রতিক বাজার প্রবণতা প্রতিফলিত করে। এছাড়াও, উৎপাদন পরিসংখ্যান, রপ্তানি পরিমাণ ও মূল্য পরিবর্তনের তথ্য প্রবণতা বিশ্লেষণের জন্য The Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA), Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCIS), FAO, এবং NABARD-এর সরকারি ডেটাবেস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে।

সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণে গুণগত এবং পরিমাণগত উভয় পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়েছে। গুণগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবেষণার প্রবণতা, প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা এবং নীতিগত ঘাটতি নির্ধারণ করা হয়েছে। পরিমাণগত বিশ্লেষণে উৎপাদন পরিসংখ্যান, বাজারমূল্য এবং রপ্তানি প্রবণতার তথ্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সমস্ত তথ্যকে বিষয়ভিত্তিকভাবে সাজিয়ে পান চাষের বর্তমান অবস্থা, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা এবং প্রয়োজনীয় গবেষণার ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে।

ভারতে পান পাতার প্রকারভেদ ঃ

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পান গাছের বহু প্রজাতি বিদ্যমান, যেগুলো পাতার গঠন, রং, স্বাদ ও গন্ধের দিক থেকে সুনির্দিষ্টভাবে ভিন্ন। ভৌগোলিক পরিবেশ কিছুটা হলেও পাতার নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের উপর প্রভাব ফেলে। তুলনামূলকভাবে অনুকূল পরিবেশে উৎপন্ন পাতা সাধারণত আকারে বড় হয় এবং কম ঝাঁজযুক্ত হয়, যেখানে অনুকূল পরিবেশের অভাবে উৎপন্ন পাতাগুলো ছোট ও অধিক ঝাঁজযুক্ত হয়ে থাকে। বিশ্বে প্রায় ১০০টি প্রজাতির পান গাছ রয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ৪০টি প্রজাতি ভারতে পাওয়া যায় এবং এই ৪০টির মধ্যে প্রায় ৩০টি প্রজাতির পান শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই দেখা যায় (Jana, ১৯৯৫)। পাতার আকার, গঠন, ভঙ্গুরতা এবং স্বাদের ভিত্তিতে পানলতাকে ঝাঁজযুক্ত ও অঝাঁজযুক্ত; এই দুই প্রকারে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়।

এলাকা এবং উৎপাদন ঃ

পান গাছের চাষ ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্যানজাত ফসল, যা ধীরে ধীরে একটি অর্থকরী ফসল হিসাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। অন্ধ্র প্রদেশ, ওড়িশা, কর্ণাটক, কেরালা, তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ, অসম, বিহার, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্রে পান গাছের চাষ ঐতিহ্যগত পদ্ধতিতে হয়ে থাকে। ভারতে প্রায় ৫৫,০০০ হেক্টর জমিতে পান গাছের চাষ হয় এবং এর বার্ষিক উৎপাদন মূল্য প্রায় ৯০০ কোটি টাকা, যা প্রায় ১.৫ কোটি মানুষের জীবিকা

সারণী ১: ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে পান পাতার প্রধান প্রকারভেদ—

ক্রমিক নং	রাজ্য	প্রধান প্রকারভেদ
১	অন্ধ্রপ্রদেশ	তেল্লাকু, করাপাকু, চেন্নুর, বাংলা, কাল্লিপত্তি
২	অসম	খাসিপত্তি, অসমপত্তি, আওনিপান, বাংলা, গারোকার্বি
৩	বিহার	বাংলা, মঘাই, কাপুরী, ক্যালকাত্তিয়া, সাঁচি
৪	কর্ণাটক	কারিয়ালে, মাইসোরালে, অম্বাদিয়ালে
৫	কেরালা	নাদানকোড়ি, কালকোডি, তুলসিভেটিলা, ফোজিকোডি
৬	মধ্যপ্রদেশ	বাংলা, মঘাই, দেশি, দেশওয়ারি, ক্যালকাত্তিয়া
৭	মহারাষ্ট্র	কালিপত্তি, কাপুরী, রামটেক বাংলা, বাংলা
৮	ওড়িশা	গোধী বাংলা, নওরা বাংলা, সাঁচি, জগন্নাথী, বিরকলি
৯	তামিলনাড়ু	পচাইকোডি, ভেল্লাইকোড়ি, কাপুরী
১০	উত্তর প্রদেশ	বাংলা, মঘাই, দেশওয়ারি, ক্যালকুটিয়া বাংলা, মহোবা, কাকের
১১	পশ্চিমবঙ্গ	বাংলা, মিঠা, সাঁচি, মাঘী, ঢোলডোগা

উৎস: চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯৭

নিশ্চিত করে। পশ্চিমবঙ্গ এর প্রধান উৎপাদক রাজ্য, যা ভারতের মোট পান পাতা উৎপাদনের ৬৬%-এরও বেশি অবদান রাখে (Guha, ২০০৬)। ভারতের পান পাতার বার্ষিক উৎপাদন প্রায় ৬০০ থেকে ৭০০ মোট /হেক্টর হয়ে থাকে, যেখানে এক মোট ১০,০০০ পাতা ধারণ করে।

সারণী ২: ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রধান উৎপাদনকারী রাজ্যগুলিতে পান চাষের এলাকা এবং উৎপাদন

ক্রমিক নং	রাজ্য	চাষের আওতায় এলাকা (হেক্টর)	উৎপাদন (মেট্রিক টন)
১	পশ্চিমবঙ্গ	১৯৩১৩	৬৬৪৪৪৫
২	অন্ধ্রপ্রদেশ	২১৩৮	৫১৩২২
৩	কর্ণাটক	৬২৫৫	৪৯৪৭০
৪	ওড়িশা	২৭৪১	৪১০৫৫
৫	উত্তরপ্রদেশ	২৬৫	২১২৪৫
৬	কেরালা	২৫৬	৯১৫০
৭	ত্রিপুরা	৫৮৪	৭৯৪২
৮	তামিলনাড়ু	১৫৬২	৫৫২৩
৯	নাগাল্যাণ্ড	১২৫	৪৪৪
১০	মধ্যপ্রদেশ	৫৭২	৩৫৫
১১	তেলেঙ্গানা	৯	১৬২
	মোট	**৩৩৮২০**	**৮৫১১১৩**

উৎস: ভারত সরকারের কৃষি ও কৃষক কল্যান মন্ত্রণালয়, ২০২৩

পান পাতা উৎপাদনের কৃষিতত্ত্ব ঃ

প্রাকৃতিক পরিবেশে পান গাছের চাষ প্রধানত উপদ্বীপীয় ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় বনাঞ্চল এবং অসমের পাহাড়ি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। তবে কৃত্রিম পরিবেশে এটি দেশের প্রায় প্রতিটি অংশে চাষ করা সম্ভব, যদিও তা বিস্তৃতভাবে নয়। পান গাছের দুটি প্রধান প্রকার থাকে, পুরুষ এবং মহিলা। মহিলা প্রকারভেদ সাধারণত বরোজে চাষ করা হয়, যেখানে পুরুষ প্রকার খোলা জায়গায় অন্যান্য গাছের ছায়ায় জন্মায় (Chattopadhyay, ১৯৯৭)। এই গাছগুলি সেরা ফলন দেয় ছায়াযুক্ত পরিবেশে, যেখানে কম আলো, মৃদু তাপমাত্রা (১০° থেকে ৩৫° সে.), উচ্চ আর্দ্রতা এবং মাঝে মাঝে বৃষ্টি (১৪০০ থেকে ১৭৫০ মিমি) সহ সারা বছর জলসেচ দেওয়া হয় (Acharjee and Sengupta, ১৯৯১)। এখানে, বরোজের মধ্যে কৃত্রিমভাবে একটি শীতল, আর্দ্র এবং ছায়াযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়। যদি এই পরিবেশ কৃত্রিমভাবে তৈরি না করা হয়, তবে তাপমাত্রার তীব্রতা পাতাগুলিকে পুড়িয়ে ফেলতে পারে এবং শীতল প্রবাহের কারণে পাতা পড়ে যায় এবং হলুদ হয়ে যায়; তীব্র বাতাসে পাতা ছিঁড়েও যেতে পারে। যদিও এই উদ্ভিদগুলি বিভিন্ন ধরনের মাটিতে ভালোভাবে বেড়ে উঠতে পারে, তবে সামান্য ক্ষারীয় প্রকৃতির (pH ৭.০ থেকে ৮.০) উঁচু জমিতে এগুলোর সর্বোত্তম বৃদ্ধি ও ফলন দেখা যায়। তবে, কয়েক দিনের জন্য জলাবদ্ধতা হলে পান গাছ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ভালো জল ধারণ ক্ষমতা এবং জৈব উপাদান সমৃদ্ধ মাটি পান গাছের জন্য আদর্শ বলে বিবেচিত হয়। সাধারণত, পান গাছের একটি বরোজ ৮ থেকে ১০ বছর পর্যন্ত অর্থনৈতিক ফলন দেয়, তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা রোগের কারণে এটি আরও কম হতে পারে; অন্যদিকে খারাপ মাটির নির্বাচন উৎপাদনের আয়ু কমিয়ে দেয়। মিঠা পান শুধুমাত্র দোয়াঁশ মাটিতে ভালো হয়, তবে সাঁচি এবং বাংলা পান দোআঁশ মাটির পাশাপাশি মাটিকাদা দোআঁশ বা কাদামাটির দোআঁশ মাটিতেও চাষ করা যায়। পান পাতার গুণমান এবং ফলন মাটির তারতম্যের উপর বহুলাংশেই নির্ভরশীল (Jana, ১৯৯৫)।

মাইক্রোক্লাইমেট বা অনু-জলবায়ু পরিবেশের শর্তগুলি উচ্চ গুণমানের পান পাতার উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আদর্শ শর্তগুলি কৃত্রিমভাবে তৈরি পাটকাঠি ও খড়ের ছাদযুক্ত বরোজের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। বরোজটি স্থানীয় উপকরণ যেমন বাঁশ, চটের লাঠি, উলু ঘাস, নারিকেলের দড়ি ইত্যাদি দিয়ে নির্মিত হয়। বরোজ স্থাপন করার প্রাথমিক খরচ অবস্থান, কাঁচামালের প্রাপ্যতা, পারিবারিক শ্রম এবং ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উপর নির্ভর করে (Acharjee and Sengupta, ১৯৯১)। জমি সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত করার পর, প্রয়োজনে উভয় পাশে উপযুক্ত ঢাল রেখে জমি কিছুটা উঁচু করা হয়, যাতে জল নিষ্কাশনের সুবিধা হয়। এরপর ২ থেকে ২.৫ ফুট অন্তর প্রায় ৩-৪ ইঞ্চি গভীর সরু মাদ তৈরি করা হয়। এসব মাদ স্থানীয়ভাবে 'খাড়ি' নামে পরিচিত যাতে গাঁটবিশিষ্ট অন্তিম কাটিং ৬ থেকে ৮ ইঞ্চি ব্যবধানে রোপণ করা হয় এবং তা মাটির দ্বারা আচ্ছাদিত করা হয়। বরোজের কাঠামো সাধারণত বর্গাকার বা আয়তাকার আকারে হয় এবং এটি ৩-৫ ডেসিমেল থেকে এক একর বা তার বেশি এলাকা নিয়ে তৈরি হতে পারে।

একটি আদর্শ বা ভাল বরোজের মধ্যে চারা বসানোর স্থান, যাতায়াতের রাস্তা ও জল নিষ্কাশনের নালিগুলি এমনভাবে তৈরী বা নির্মাণ করতে হবে যেন জমিতে সব থেকে বেশি চারা বসানো যায়, পানের লতার পুষ্টি ও বৃদ্ধি ঠিক মতো হয়, লতার পরিচর্যা ও যত্ন প্রয়োজন মাফিক করার জন্য লতার পক্ষে যতটা সম্ভব আরামদায়ক ব্যবস্থা থাকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাসমূহ থাকে। সাধারণত বরোজে দেয়ালের পাশ দিয়ে প্রায় ৩ ফুট প্রশস্ত হাঁটার পথ খালি রাখা হয় এবং বিভিন্ন সারির গুচ্ছের মাঝে আরও প্রশস্ত পথ রাখা হয়। চারা রোপণ সাধারণত ফেব্রুয়ারি-মার্চ বা জুন-আগস্ট মাসে করা হয় (Sengupta, ১৯৭৮)। নতুন বরোজে পান গাছ লাগানোর জন্য সোলারাইজেশন কৌশল ব্যবহার করা উচিত (Jana, ১৯৯৬)। গ্রীষ্মকালে এক মাসের তীব্র রোদে জমি ভালোভাবে সূর্যের আলোতে জীবাণুমুক্ত করতে হবে। বরোজের জমিকে একটি স্বচ্ছ পলিথিনের চাদর দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

১০-১২ দিনের পরে খুব অল্প সময়ের জন্য চাদর সরিয়ে সকালের দিকে অল্প জল ছিটিয়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আবার পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। এভাবে এক মাসের বেশি সময় ধরে জমি সূর্যের আলোতে শোধন করতে হবে, এরপর ৪০% ফরমালিন এবং জলের সঙ্গে ১:৫০ অনুপাতে মিশিয়ে জমি ভালোভাবে ভিজিয়ে (প্রতি বর্গমিটারে ৩ লিটার হারে ফরমালিন দ্রবন) পলিথিন চাদর দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। ২-৩ দিন পর ঢাকনা সরিয়ে দিয়ে ২০-২৫ দিন পর পান গাছের চারা বা কাটিং লাগানো যেতে পারে।

চারা তৈরির জন্য পছন্দসই স্বাস্থ্যবান লতা বেছে নিয়ে তা থেকে চারা তৈরি করা হয়। প্রতি কাঠা জমির জন্য প্রায় ৬০০-৭০০ টি এক গাঁটযুক্ত কাটিং (একরে প্রায় ৩৬ থেকে ৪২ হাজার কাটিং) দরকার হয়, যা ২-৩ বছর বয়সী পুরনো বরোজ থেকে সংগ্রহ করা হয়। রোগমুক্ত, স্বাস্থ্যকর এবং পরিণত 'মা' গাছ নির্বাচন করার পর, কাটিং সংগ্রহ করার অন্তত ৭-১০ দিন আগে ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত। জৈব ছত্রাকনাশক এবং জীবাণুনাশক যেমন ট্রাইকোডারমা ভিরিডি এবং সিউডোমোনাস ফ্লুরোসেন্স জৈব সারগুলির সাথে মিশিয়ে গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করা যেতে পারে অথবা রাসায়নিক ঔষধ, ১.৫ শতাংশ বোর্দো মিশ্রণ বা অন্যান্য তামা-ভিত্তিক ঔষধ যেমন ব্রাইটক্স, ফাইটোলান, ব্লু-কপার (৪ গ্রাম/লিটার জল) ব্যবহার করা যেতে পারে। রোপণের আগে পিলিগুলো ছত্রাকজনিত রোগ থেকে সুরক্ষার জন্য শোধন করা হয়। এরজন্য কপার অক্সিক্লোরাইড ৫০ শতাংশ ডব্লু. পি (৪ গ্রাম/লিটার) বা কপার হাইড্রোক্সাইড ৭৭ শতাংশ ডব্লু. পি (২-৩ গ্রাম/লিটার) অথবা মেটাল্যাক্সিল ৮ শতাংশ এবং ম্যানকোজেব ৬৪ শতাংশ (২.৫ গ্রাম/লিটার) সঙ্গে স্ট্রেপ্টোমাইসিন সালফেট এবং টেট্রাসাইক্লিন হাইড্রোক্লোরাইড (২.৫ গ্রাম/১০ লিটার জল) এর মিশ্রণ প্রয়োগ করা যেতে পারে। এরপর কাটিংগুলি বরোজের মধ্যে পিলিতে হালকা চেপে বসিয়ে দেওয়া হয় (SATSA, WB, ২০১৩)।

'পান' কৃষি অর্থনীতি ঃ

বরোজ নির্মাণসহ পান চাষের প্রাথমিক ব্যয় প্রথম বছরে প্রতি হেক্টরে আনুমানিক ১ থেকে ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হতে পারে, যা পরবর্তী বছরে কমে গিয়ে ৫০ থেকে ৬০ হাজার প্রতি হেক্টর হয়। একটি সুসংগঠিত ও সঠিকভাবে পরিচালিত খামারের ক্ষেত্রে প্রতি হেক্টরে বছরে গড়ে ৫০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকা বা তারও বেশি লাভ পাওয়া সম্ভব, তবে এই পরিসংখ্যান কৃষিকর্মের বিভিন্ন উপাদান যেমন কৃষি-জলবায়ু পরিস্থিতি, জমির অবস্থান, প্রকারভেদ, চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য, মরসুম, পণ্যের মূল্য ওঠানামা, মুদ্রাস্ফীতি ইত্যাদির উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে (Guha, ২০০৬; ICAR, ২০০০)। বরোজ স্থাপনের সময় কৃষকদের একটি প্রাথমিক মূলধনের প্রয়োজন হয়, কারণ শুরুতে ব্যয় তুলনামূলকভাবে বেশি হয়ে থাকে। তবে দ্বিতীয় বছরের শেষ নাগাদ চাষ লাভজনক হয়ে ওঠে এবং উৎপাদন খরচের চেয়ে বেশি আয় হতে শুরু করে, ফলে কৃষক ঋণ পরিশোধে সক্ষম হন। যদিও সচ্ছল ও আর্থিকভাবে স্বনির্ভর কৃষকদের জন্য এ ধরনের ঋণের চাহিদা কম, কিন্তু সাধারণ বা মধ্যবিত্ত কৃষকদের, যাদের হাতে পর্যাপ্ত সঞ্চয় থাকে না, তাদের জন্য এই ধরনের ঋণ বা আর্থিক সহায়তা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বাস্তবিক অর্থে, এখনো পর্যন্ত কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ নতুন বরোজ স্থাপন বা বৃহৎ পরিসরে পুরোনো বরোজের পুনর্গঠনের জন্য প্রদান করার উদাহরণ নেই। এই পরিস্থিতিতে জমি বন্ধক, কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক এবং সমবায় সংস্থাগুলোর মতো প্রতিষ্ঠানগুলিকে পানচাষে অর্থায়নের জন্য আরও উপযোগী করা যায় বলে মনে করা যেতে পারে। একটি পান বরোজকে চাষির জন্য পারিবারিক ব্যাংক হিসেবে বিবেচনা করা যায়, কারণ প্রয়োজনে তা থেকে নগদ অর্থের মতোই পাতা তুলে বাজারে বিক্রি করে তাৎক্ষণিক আর্থিক প্রয়োজনে ব্যবহার করা যায়, এবং এই সুবিধা ১০ থেকে ৩০ বছর বা তারও বেশি সময় ধরে চলতে পারে (Chattopadhyay, ১৯৮১; Jana, ১৯৯৫)।

পানপাতা একটি বহুবর্ষজীবী অর্থকরী ফসল, যা চা পাতার মতো বারবার সংগ্রহযোগ্য এবং এর উৎপাদনের সর্বোচ্চ সময়কাল জুন থেকে সেপ্টেম্বর,

অর্থাৎ বর্ষাকাল, যখন গাছে অধিক সংখ্যক পাতা গজায় ও তুলনামূলকভাবে বেশি পরিমাণে সংগ্রহ করতে হয়। তবে উন্নত গুণমানের পরিণত পাতা বাজারজাত করার জন্য লতায় রেখে দেওয়া হয়, যাতে সেগুলো আরও ভালো গঠন, আকার, রং ও স্থায়িত্ব অর্জন করে এবং শীতকালে সরবরাহ করা যায়, যখন বাজারে পাতার জোগান কম থাকায় দাম বেশি থাকে। ব্যবসায়ীদের কাছে পরিণত পাতার চাহিদা বেশি কারণ বর্ষাকালে নতুন পাতার অপচয়ের হার তিন গুণ বেশি হয়। যদিও পানপাতার চাহিদা বছরে মোটামুটি স্থির থাকে, কৃষকদের বর্ষাকালে অতিরিক্ত উৎপাদনের কারণে তুলনামূলকভাবে কম দামে পণ্য বিক্রি করতে বাধ্য হতে হয়, যা অনেক সময় শীতকালীন দামের এক-পঞ্চমাংশ পর্যন্ত নেমে যায়।

পানপাতার বিপণন ব্যবস্থায় 'চালানদার' বা মধ্যস্বত্বভোগীরা মূল ভূমিকা পালন করেন এবং বাজার নিয়ন্ত্রণ করেন এমন ব্যবসায়ীরা, যারা উৎপাদন অঞ্চল বা স্থানীয় বাজার থেকে অনেক দূরে অবস্থান করেন, ফলে বাজারে পণ্যের চাহিদা ও দামের উপর কৃষকের তেমন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। এই পরিস্থিতিতে পানপাতার জন্য একটি নিয়ন্ত্রিত ট্রেডমার্ক ও সুবিন্যস্ত বাজার পরিচালন ব্যবস্থার প্রয়োজন, যা উৎপাদন ও ভোক্তা উভয় অঞ্চলে তথ্য ও সমন্বয় সরবরাহ করবে, এবং কৃষকদের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি করবে।

পানের পাতার অপচয় হ্রাস এবং শিল্প সম্ভাবনাঃ

পানের পাতা একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল ফসল, যা সহজেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জলশূন্যতা, ছত্রাক সংক্রমণ, ক্লোরোফিল হ্রাস ইত্যাদি কারণে পাতা দ্রুত পচে যায়, ফলে ফসল সংগ্রহের পরবর্তীক্ষেত্রে পরিবহন ও সংরক্ষণের সীমাবদ্ধতার কারণে ৩৫-৭০ % ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে, যা বছরে প্রায় ৯০০ মিলিয়ন টাকার আর্থিক ক্ষতির সমতুল্য (Rao ও Narasimham, ১৯৭৭)। বর্ষাকালে অতিরিক্ত উৎপাদনের কারণে অনেক পাতা অবিক্রীত থাকে অথবা ন্যূনতম দামে বিক্রি হয়, ফলে কৃষকরা প্রায়শই চাষের পরিমাণ কমাতে বাধ্য হন। অপচয় হ্রাসের একটি কার্যকর পদ্ধতি হলো অতিরিক্ত পাতাগুলি থেকে তেল নিষ্কাশন করা। আইআইটি খড়গপুরে উদ্ভাবিত "Betel Leaf Oil Extractor" যন্ত্রের মাধ্যমে পানের পাতা থেকে তেল সংগ্রহ করা সম্ভব। মিঠা, বাংলা এবং সাঁচি জাতের পাতা থেকে যথাক্রমে ২.০%, ১.৭% এবং ০.৮% তেল নিষ্কাশন করা সম্ভব। বাংলা জাতের তেলে প্রায় ২১টি রাসায়নিক যৌগ চিহ্নিত হয়েছে, যার মধ্যে ইউজেনল (২৯.৫%) প্রধান উপাদান। অন্যান্য জাতের তেলেও অনুরূপ যৌগ পাওয়া যায়, তবে কিছু জাতের তেলে টারপেনিল অ্যাসিটেট প্রধান উপাদান হিসেবে উপস্থিত থাকে। এই তেলের ঔষধি, সুগন্ধি ও টনিক গুণাবলীর কারণে এটি প্রসাধনী, ওষুধ এবং সুগন্ধি শিল্পে একটি সম্ভাবনাময় কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। এই তেল থেকে টুথপেস্ট, ফেস ক্রিম, সাবান, সুগন্ধি, রুম ফ্রেশনার, অ্যান্টিসেপটিক লোশন, ঠান্ডা পানীয়, চকোলেট, আগরবাতি, হজমবর্ধক ওষুধ এবং টনিকসহ বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন করা সম্ভব (Guha, ২০০০)। অতএব, 'পানের পাতা ও এর তেল থেকে পণ্য উন্নয়ন' সম্পর্কিত গবেষণা একদিকে পাতার অপচয় হ্রাসে সহায়ক হবে, অন্যদিকে কৃষি ও শিল্প উভয় ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করবে।

পান পাতার ঔষধি এবং পুষ্টিকর গুণঃ

খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে, যখন আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতির প্রচলন শুরু হয়, তখন থেকেই পান-এর ঔষধিগুণ সম্পর্কে অবহিত ছিল মানুষ। প্রাচীন গ্রন্থ জ্যোতির্নিবন্ধ-এ উল্লেখ করা হয়েছে: যে ব্যক্তি সকালে নির্দিষ্ট মাত্রায় সুপারি, মধ্যাহ্নে চুন, এবং রাত্রে অধিক পরিমাণে পান পাতা সহ তাম্বুল সেবন করে, সে ধীরে ধীরে সমৃদ্ধি লাভ করে। এই উক্তি প্রমাণ করে যে, পান শুধু রসনাতৃপ্তির উপাদান নয়, বরং একে স্বাস্থ্যরক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হিসেবে গণ্য করা হতো। এর মধ্যে থাকা উপাদানগুলি বিভিন্ন সময়ে দেহের উপকারে আসে; সুপারি উদ্দীপক, চুন হজমে সহায়ক, এবং পান পাতা অ্যান্টিসেপটিক ও

সতেজতাদায়ক গুণে পরিপূর্ণ (Gode, ১৯৬১)। তবে মনে রাখা জরুরি যে, পানপাতা শুধুমাত্র আহারের পরেই উপকারী (Percival, ১৮৭৪)। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষত পাহাড়ি উপজাতিদের মধ্যে, নানা রোগের চিকিৎসায় পানপাতা ব্যবহারের প্রচলন দীর্ঘদিন ধরেই প্রচলিত। খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ের বাসিন্দারা পানপাতাকে ঘুম আনয়নকারী, ব্যথানাশক এবং শীতকালে দেহের উষ্ণতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন। সাঁওতাল, মুন্ডা ও ওঁরাও উপজাতির মানুষদের মধ্যে পুঁজযুক্ত ক্ষতের চিকিৎসায় পানপাতা ব্যবহার একটি পরিচিত পদ্ধতি (Chattopadhyay, ১৯৯৭)। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে পানপাতার সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে কৃষিবিজ্ঞানী, রসায়নবিদ, শারীরবিজ্ঞানী ও শল্য-চিকিৎসকদের একযোগে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। পানপাতা হালকা উত্তেজক, কষকারক, সুগন্ধযুক্ত, জীবাণুনাশক, হজমে সহায়ক এবং গ্যাসনাশক হিসেবে কাজ করে। এটি ফুসফুসজনিত রোগ, ডিপথেরিয়া এবং শ্লেষ্মাজনিত রোগে বিশেষ উপকারী। পানপাতায় বিদ্যমান প্রদাহ-নাশক উদ্বায়ী তেল ফোঁড়ার সংক্রমণ প্রতিরোধে সহায়তা করে। অনেক গবেষকের মতে, পানপাতার রস থেকে যক্ষ্মা এবং ক্যানসারের মতো মারাত্মক রোগের ওষুধ প্রস্তুত করা সম্ভব। পান পাতার তেল ১:১০০০ অনুপাতে জলের সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করলে কলেরা জীবাণুর বৃদ্ধি রোধ করা যায়, ১:৩০০০ অনুপাতে ডায়েরিয়া ও টাইফয়েডের জীবাণু এবং ১:৫০০০ অনুপাতে ব্যবহার করলে যক্ষ্মার জীবাণু (Mycobacterium tuberculosis) ধ্বংস করা সম্ভব (Jana, ১৯৯৫)।

পান তেল পান গাছের পাতা থেকে প্রাপ্ত হালকা হলুদ বা বাদামী বর্ণের তীব্র ঝাঁজালো ও মশলাদার ঘ্রাণ যুক্ত একপ্রকার প্রাকৃতিক অত্যাবশ্যক তেল । এটি বাষ্পীয় পাতন (Steam Distillation) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। পান তেলের পরিমাণ নির্ভর করে তার নমুনা (type), পান তোলার সময় (time of plucking), পানের অবস্থা (তাজা অথবা

সারণী ৩: পান পাতার পুষ্টিগত উপাদান

ক্রমিক নং	উপাদান	আনুমানিক পরিমাণ	ক্রমিক নং	উপাদান	আনুমানিক পরিমাণ
১	জল	৮৫.৪০%-৯০.০০%	১০	ফসফরাস	০.০৪-০.৬০%
২	চর্বি	৩.৮০%	১১	পটাসিয়াম	১.১০-৪.৬০%
৩	প্রোটিন	৩.১০%	১২	লোহা	৫.১০-৭.০০%
৪	খনিজ	২.৩০%	১৩	শক্তি	৪৪ কিলোক্যাল/ ১০০ গ্রাম
৫	আঁশ	২.৩০%	১৪	রাইবো ফ্লাভিন	১.৯-৩০ মাইক্রোগ্রাম/ ১০০ গ্রাম
৬	শর্করা	৬.১০%	১৫	থায়ামিন	১০-৭০ মাইক্রোগ্রাম/ ১০০ গ্রাম
৭	নিকোটিনিক অ্যাসিড	০.৬৩-০.৮৯ মিলিগ্রাম/১০০গ্রাম	১৬	ভিটামিন সি	০.০০৫-০.০১%
৮	ক্যালসিয়াম	০.২৩-০.৫০%	১৭	ভিটামিন এ	১.৯-২.৯ মিলিগ্রাম/ ১০০ গ্রাম
৯	নাইট্রোজেন	২.০০-৭.০০%	১৮	অপরিহার্য তেল	০.০৮-০.২%

সূত্র: জানা, ১৯৯৫ এবং গুহ, ২০০৬

শুকনো), সাদা করা পাতা (bleached) না সবুজ পাতা (unbleached) ইত্যাদির উপর। সাদা পানে তেলের পরিমাণ বিশেষভাবে বাড়ে। এই তেলই পানের ভেষজ গুণাবলীর উৎস, তাই পানপাতা সেবনে হজম শক্তি বাড়ে, ফুসফুসের রোগ ভাল হয়, কাটা-পোড়া দ্রুত সারে। সাধারণত পানের লতার উপরের দিকের পাতায় পান-তেল বেশী থাকে। তবে পাতার বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তেলের পরিমাণও বাড়ে। পাকা পান পাতায় তেলের পরিমাণ কমে যায়। এই তেল ফেনল বা তারপিন জাতীয় যৌগ পদার্থ দিয়ে তৈরী। Phenol এর পরিমাণ যত বেশী হবে, পান-তেলের উৎকর্ষতা তত বেশী হবে ও পান চিবুলে মুখ ও পেটে গরমভাব বৃদ্ধি পাবে। পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদিত পানে Phenol Compound-এর পরিমাণ সব থেকে বেশী, শতকরা প্রায় ৫.৮-৮ ভাগ। এই তেলের মধ্যে chavicol বা para-allyphenol নামে একটি ফেনলিক যৌগ আছে। এ রাজ্যে উৎপাদিত পানে যথেষ্ট পরিমাণে (শতকরা ৭.২ ভাগ পর্যন্ত) chavicol থাকে। এর ফলে পানের ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া নাশক গুণ ও সংরক্ষণ ক্ষমতা দেখা যায় (Jana, ১৯৯৫)।

পানপাতা অত্যন্ত পুষ্টিকর একটি প্রাকৃতিক উপাদান। এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন, কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, অ্যালকালয়েড, উদ্বায়ী তেল, ফেনলিক যৌগ এবং নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, লৌহ, আয়োডিনসহ নানা খনিজ উপাদান বিদ্যমান। ভিটামিনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ক্যারোটিন, থায়ামিন, রাইবো ফ্লাভিন, নিকোটিনিক অ্যাসিড এবং ভিটামিন 'সি'। ভারতের Indian Research Fund Association-এর অধীন তামিলনাড়ুর উৎকুর কুডাপ্পার বিটেল ভাইন রিসার্চ স্টেশনে প্রকাশিত এক গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে যে;''চুনসহ ছয়টি পানপাতা খাদ্যগুণের দিক থেকে ১০ আউন্স গরুর দুধের সমতুল্য।" এই তথ্য পানপাতার পুষ্টিমূল্য এবং সম্ভাব্য খাদ্য বিকল্প হিসেবে এর গুরুত্বকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরে।

জাতীয় অর্থনীতিতে পান পাতার ভূমিকা ঃ

ভারতে প্রায় ১.৫ থেকে ২ কোটি মানুষ পান পাতা সেবন করেন, যা এর বিপুল চাহিদা এবং অর্থনৈতিক গুরুত্বকে নির্দেশ করে। প্রায় ২৫-৩০ লক্ষ পরিবার এবং ১.৫ কোটি মানুষ সরাসরি বা পরোক্ষভাবে পান চাষের সঙ্গে জড়িত, যা গ্রামীণ অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। শুধু কর্মসংস্থান সৃষ্টি নয়, পান পাতা দেশের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। পান পাতার ভালো রপ্তানি সম্ভাবনা রয়েছে, ফলে এটি একটি বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল, যা দেশের জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সক্ষম (Guha, ২০০৬)। এই কারণে পান পাতা ভারতের জাতীয় অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ভারতের মোট পান পাতার চাহিদার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ পশ্চিমবঙ্গেই উৎপাদিত হয়। রাজ্যের প্রায় এক লক্ষ বরোজ থেকে বছরে আনুমানিক ৩.০৪ লক্ষ কোটি পান পাতা উৎপন্ন হয়। প্রায় ৫ লক্ষ পরিবার এই চাষে নিয়োজিত এবং এই খাত থেকে বার্ষিক গড় আয় হয় প্রায় ৮০ থেকে ১০০ কোটি টাকা (Jana,১৯৯৫)। পশ্চিমবঙ্গের মোট উৎপাদনের প্রায় ৭৩% রাজ্যের বাইরে রপ্তানি করা হয় এবং অবশিষ্ট ২৭% রাজ্যের অভ্যন্তরে ব্যবহৃত হয়।

বিশ্বের সর্ববৃহৎ পান পাতা উৎপাদক দেশ হিসেবে ভারত আন্তর্জাতিক বাজারে সুদৃঢ় অবস্থান বজায় রেখেছে এবং বর্তমানে বিশ্ব রপ্তানির প্রায় ৪৬.২৯% ভারত থেকেই সরবরাহ করা হচ্ছে। এই পরিসংখ্যান পান পাতা রপ্তানিতে ভারতের সম্ভাবনাময় অংশগ্রহণকে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত করে, যা দেশের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশক। এছাড়া পানের তেলের রপ্তানিকারক দেশ হিসাবে ভারত একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যেখানে Katyani, Kanta Group, DBR Exports India এবং AOS Products Pvt. Ltd.-র মতো কোম্পানিগুলি বিশ্ববাজারে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। ভোলজা'র (Volza) ভারতীয় রপ্তানি পরিসংখ্যান অনুযায়ী (আপডেট: ১৭ মার্চ ২০২৫), সেপ্টেম্বর ২০২৩ থেকে আগস্ট ২০২৪ সময়কালে ভারত থেকে মোট ১২টি পানের তেল রপ্তানির চালান পাঠানো হয়েছে। ভারত থেকে রপ্তানিযোগ্য

পান তেলের বেশিরভাগটাই ভিয়েতনাম, যুক্তরাষ্ট্র এবং সিঙ্গাপুরে পাঠানো হয়ে থাকে। বিশ্ববাজারে পানের তেল রপ্তানিতে ভারত শীর্ষস্থানে রয়েছে। প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্যগত উপকারিতার কারণে এ তেলের চাহিদা ক্রমশও বাড়ছে। তবে যথাযথ নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহারের সঠিক নির্দেশনা ছাড়া এর অতিরিক্ত ব্যবহারে স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি হতে পারে। বিশ্বব্যাপী পানের তেলের রপ্তানি বাজারের আকার ২০২১ সালে ছিল প্রায় ৯.৩৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং এটি ২০৩২ সালের মধ্যে ১৮.৮৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছানোর সম্ভাবনা রয়েছে, যার বার্ষিক যৌগিক প্রবৃদ্ধির হার (CAGR) ধরা হয়েছে ৬.৫৯% (Business Research Insights, 31st March, 2025)।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভারত ঃ

তথ্যসূত্র সারণীটিতে ২০১৮-১৯ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থ বছর পর্যন্ত পানের রপ্তানির প্রবণতা উপস্থাপন করা হয়েছে, যেখানে রপ্তানির পরিমাণে ধারাবাহিকভাবে উল্লেখযোগ্য পতন লক্ষ্য করা যায়। ২০১৮-১৯ সালে রপ্তানি পরিমাণ ছিল ১৩,১৯৫.৪৩ মেট্রিক টন, যা ২০১৯-২০ সালে ২১.৩% হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ১০,৩৮৬.৫২ মেট্রিক টনে। এর মূল কারণ ছিল আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি, উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি এবং বিশ্ব চাহিদার পরিবর্তন। ২০২০-২১ অর্থ বছরে কোভিড-১৯ মহামারির কারণে রপ্তানি আরও কমে দাঁড়ায় ৬,১৫৯.৩৯ মেট্রিক টনে, যা আগের বছরের তুলনায় ৪০.৭% হ্রাস পায়। ওই সময়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কার্যক্রমে স্থবিরতা, সরবরাহ শৃঙ্খলে বিঘ্ন এবং লজিস্টিক সমস্যার কারণে রপ্তানির পরিমাণ তীব্রভাবে কমে যায়। ২০২১-২২ সালে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলেও রপ্তানি পরিমাণ ছিল ৬,৫১৭.২৬ মেট্রিক টন, যা প্রাক-কোভিড সময়ের তুলনায় অনেক কম। এরপর ২০২২-২৩ এবং ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে রপ্তানি পরিমাণ যথাক্রমে ৩,৪৪০.০৮ মেট্রিক টন এবং ১, ৬২০.০৬ মেট্রিক টনে নেমে আসে। এর প্রেক্ষিতের প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখযোগ্য হলো উৎপাদন সংকট, আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদার পরিবর্তন, নীতি সহায়তার অভাব, এবং রপ্তানিকৃত পণ্যের প্রতিযোগিতামূলক মূল্য হারানো।

অন্যদিকে, রপ্তানি মূল্যে ভিন্ন প্রবণতা দেখা গেছে। ২০১৮-১৯ সালে রপ্তানি মূল্য ছিল ৪৬.৭৫ কোটি টাকা (৬.৭৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার), যা কোভিডের সময়ে ২০২০-২১ সালে ২৬.১৮ কোটি টাকা (৩.৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) এ নেমে আসে। তবে ২০২১-২২ এবং ২০২২-২৩ অর্থ বছরে রপ্তানি মূল্যে পুনরুদ্ধার লক্ষ্য করা যায়, যা যথাক্রমে ৪৫.৯৭ কোটি টাকা (৬.১৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) এবং

সারণী ৪: বছরভিত্তিক পান পাতার রপ্তানির পরিমাণ ও মূল্য

অর্থনৈতিক বছর	রপ্তানি পরিমাণ (মেট্রিক টন)	মূল্য (কোটি টাকা)/মিলিয়ন মার্কিন ডলার
২০১৮-১৯	১৩,১৯৫.৪৩	৪৬.৭৫ / ৬.৭৪
২০১৯-২০	১০,৩৮৬.৫২	৩৭.৬০ / ৫.২২*
২০২০-২১	৬,১৫৯.৩৯	২৬.১৮ / ৩.৫৫*
২০২১-২২	৬,৫১৭.২৬	৪৫.৯৭ / ৬.১৭
২০২২-২৩	৩,৪৪০.০৮	৪৯.৬৮ / ৬.২১
২০২৩-২৪	১,৬২০.০৬	৪২.৯১ / ৫.১৮

উৎস: এপেডা (* কোভিড বছর)

৪৯.৬৮ কোটি টাকা (৬.২১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) হয়। এই মূল্য বৃদ্ধির সম্ভাব্য কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে বিশ্ব বাজারে পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি, রপ্তানিকৃত পণ্যের গুণগত মান উন্নয়ন, এবং কম পরিমাণে উচ্চমূল্যের পণ্য রপ্তানি করার কৌশল। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পরিমাণের তুলনায় মূল্য কিছুটা কমে ৪২.৯১ কোটি টাকা (৫.১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) হলেও সামগ্রিকভাবে মূল্য স্থিতিশীল থাকতে দেখা যায়।

সাম্প্রতিক অতীতে রপ্তানি পরিমাণ হ্রাসের পেছনে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণ কাজ করেছে। প্রথমত, কোভিড-১৯ মহামারির কারণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ব্যাপক বিঘ্ন ঘটে, যার ফলে সরবরাহ শৃঙ্খলে সমস্যা, শিপমেন্ট বিলম্ব এবং ক্রেতাদের অর্ডার বাতিলের কারণে রপ্তানির পরিমাণ তীব্রভাবে কমে যায়। দ্বিতীয়ত, উৎপাদন ঘাটতি এবং কাঁচামালের উচ্চমূল্য রপ্তানিকৃত পণ্যের প্রতিযোগিতামূলক মূল্য বজায় রাখতে বাধা সৃষ্টি করেছে। তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদার পরিবর্তন, বিশেষ করে প্রধান রপ্তানি গন্তব্যগুলোর মধ্যে চাহিদা হ্রাস, রপ্তানি পরিমাণের পতনে বড় ভূমিকা রেখেছে। এছাড়া, নীতি সহায়তার অভাব, বিশেষ করে রপ্তানিকারকদের জন্য দীর্ঘমেয়াদী প্রণোদনা, শুল্ক ছাড় ও সহজ ঋণের অনুপস্থিতি, রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। পাশাপাশি, গুণগত মান ও মূল্য নির্ধারণে সমন্বয় ঘাটতি এবং প্রতিযোগিতামূলক বাজারে অনুকূল অবস্থান ধরে রাখতে না পারার কারণে রপ্তানি বাণিজ্যে বিশেষ প্রভাব পড়েছে।

ভবিষ্যতে রপ্তানি খাতের পুনরুদ্ধার ও প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। প্রথমত, উচ্চমূল্যের বাজার লক্ষ্য করে মান সম্পন্ন পণ্য রপ্তানির দিকে মনোযোগ দিতে হবে, যাতে কম পরিমাণেও বেশি মূল্যে রপ্তানি করা যায়। দ্বিতীয়ত, উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধি ও গুণগত মান উন্নয়নের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিত করে রপ্তানি বাজারে প্রতিযোগিতা বাড়ানো সম্ভব। তৃতীয়ত, প্রচলিত বাজারের পাশাপাশি নতুন বাজার অনুসন্ধান ও বৈচিত্র্যকরণের মাধ্যমে নির্দিষ্ট দেশের ওপর নির্ভরতা কমানো দরকার। এছাড়া, পরিবেশবান্ধব ও টেঁকসই পণ্য উৎপাদনে বিনিয়োগ বাড়িয়ে বিশ্ব চাহিদার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া জরুরি। চতুর্থত, সরকারের পক্ষ থেকে রপ্তানিকারকদের জন্য উৎসাহ প্রদান, শুল্ক ছাড়, সহজ ঋণ ও নীতি সহায়তা বৃদ্ধি করলে রপ্তানি ক্ষেত্রটি আরও ত্বরান্বিত হবে। এসব উদ্যোগ সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে, দীর্ঘমেয়াদে রপ্তানি পরিমাণ বৃদ্ধি ও মূল্য স্থিতিশীল রেখে বৈদেশিক মুদ্রা আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা উজ্জ্বল হবে।

উপসংহার ঃ

ভারতে পান পাতার বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপনায় যে কম বেশি ২ কোটি মানুষ সরাসরি যুক্ত আছেন তারা বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে সাম্প্রতিক অতীতে অর্থনৈতিক সমস্যার মধ্যে পড়তে শুরু করেছেন। দক্ষিণ এশিয়ায় বৃষ্টিপাত বৃদ্ধি ও উষ্ণতার প্রকোপ বাড়ায় পান চাষের আদর্শ ভৌগোলিক পরিবেশ পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। লক্ষ লক্ষ পানচাষীদের কাছে শীতকালে আদর্শ ১০° সে. ও গ্রীষ্মকালে আদর্শ ৪০° সে. তাপমাত্রার ভারসাম্য বহু জায়গাতে থাকছে না। একই সঙ্গে পান পাতার বাণিজ্যিক সম্ভাবনা এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে এর উচ্চ চাহিদার ফলে ভারতের অর্থনীতি এবং বহু মানুষের জীবিকায় এর গভীর প্রভাব রয়েছে। সামাগ্রিকভাবে উৎপাদন খরচ কমানোর জন্য অধিক কার্যকর এবং অর্থনৈতিকভাবে দক্ষ পদ্ধতি গ্রহণ, এবং পরিবহন ও বিপণন ব্যবস্থাগুলিকে যথাযথভাবে ব্যবস্থাপনা করা হলে, পান পাতার এই খাত থেকে আয়ের পরিমাণ আরো বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। বর্তমানে, দেশের পান পাতার বিপণন ব্যবস্থা মূলত কমিশন এজেন্টদের মাধ্যমে পরিচালিত হয়, যারা বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির হয়ে কাজ করেন। সুতরাং উৎপাদন এবং গ্রামীণ অঞ্চলে চাহিদা সম্পর্কিত সঠিক বাজার তথ্য ব্যবস্থার ঘাটতি নিরসনে সরকারী পরিকাঠামোর সাহায্য প্রয়োজন।

পান চাষ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও কীটপতঙ্গের আক্রমণের কারণে কিছুটা ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায়, বরোজের জন্য ফসল বীমা চাষিদের জন্য এই মুহূর্তে ভরসার

জায়গা হতে পারে। বর্ষাকালে পান পাতা উৎপাদন খুব বেশি হলেও, এর দ্রুত পচনশীল প্রকৃতির কারণে সংগ্রহোত্তর ক্ষয়ক্ষতি উল্লেখযোগ্য। এমন পরিস্থিতিতে যদি হিমঘর ব্যবস্থার সুবিধা প্রদান করা যায়, তবে পান পাতাগুলি সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে এবং বাজারে সর্বোচ্চ মূল্যের সময়ে তা বিক্রি করা যাবে। পান চাষের প্রযুক্তি সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা করার জন্য চাষি ও গবেষকদের মধ্যে একটি কার্যকর যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত জরুরি। এই লক্ষ্যে, সরকারের উচিত পান পাতার চাষ উন্নত করার জন্য গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা এবং পান চাষের প্রযুক্তি ও পদ্ধতির উন্নতি সাধনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এছাড়া, পান পাতার ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্পে ব্যবহারের সম্ভাবনা নিয়ে আরো গভীর গবেষণা করা প্রয়োজন। পান পাতা ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল হওয়ায়, এর উৎপাদন ক্ষমতা বজায় রাখতে এবং চাষিদের কল্যাণ সুনিশ্চিত করতে উপযুক্ত নীতিনির্ধারণের মাধ্যমে এই সবুজ সোনার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

তথ্যসূত্র ঃ

1. Acharjee, S., & Sengupta, K. (1991). Economics of betelvine cultivation - A case study of Medinipur District of West Bengal. Economic Affairs, 36 (4).
2. Ahuja, S. C., & Ahuja, U. (2011). Betel leaf and betel nut in India- History and uses. Asian Agri - History, 15 (1), 13-35.
3. Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA). (2022). Others (Betel Leaf & Nuts). Ministry of Commerce and Industry, Government of India.
4. Business Research Insights. (2025, March 31). Betel Leaf Oil Market Size, Share, Growth, and Industry Analysis, Regional Forecast from 2024 to 2032. https-// www.businessresearchinsights.com/market-reports/betel-leaf-oil-market-102772
5. Chattopadhyay, S. B. (1997). Pan chaser kotha. Kolkata, West Bengal.
6. Chattopadhyay, S. C. (2001). Paan chas baro mas. Deyós Publishing.
7. Chattopadhyay, N. C., Das, A. K., Mukherjee, S., & Mishra, A. K. (1981). Phytochemistry of Betel Leaves and some aspects of storage. In Proceedings of G.D., Feb. 27-28. NBRI, Lucknow.
8. Directorate of Extension, Ministry of Food and Agriculture. (1960). Betelvine cultivation in India (Farm Bulletin No. 57). Farm Information Unit.
9. Gode, P. K. (1961). Studies in Indian cultural history. Vishveshvaranand Vedic Research Institute.
10. Guha, P. (2006). Betel leaf- The neglected green gold of India. Journal of Human Ecology, 19(2), 87-93.
11. Guha, P. (2000). Commercial exploitation of oil from betel leaves. In Sixth Regional Workshop on Oil Seeds and Oils (pp. 56-57). Agricultural and Food Engineering Department, IIT, Kharagpur.
12. Indian Council of Agricultural Research SICARV. S2000V. Annual report of All India Coordinated Research Project on Betelvine. National Research Centre for Medicinal and Aromatic Plants, Boriavi, Gujarat.
13. Jana, B. L. (1995). Gram banglar arthakari phasal-paan [Betel leaf - A cash crop of rural Bengal]. Asabori.
14. Jana, B. L. (1996, June 5-6). Improved technology for betel leaf cultivation. Paper presented at the Seminar-Cum-Workshop on Betel Leaf Marketing, Directorate of Agricultural Marketing, Digha, Midnapur, West Bengal.
15. Kaintura, P., Bhandari, M., & Kumar, R. (2020). Medicinal values of betel leaves and its application in food products- A review. The Pharma Innovation Journal, 9(6), 344-348.
16. Maiti, S., & Shivashankara, K. S. (1998). Betelvine research highlights (1981-1997). All India Coordinated Research Project on Betelvine.
17. Mukherjee, A. K., Bagchi, T. K., & Sarkar, S. C. (1988). Some economic aspects of marketing betelvine in West Bengal. Economic Affairs, 33S4V, 257-267.
18. Percival, P. (1874). Tamil proverbs Swith English translationV. Dinavartani Press.
19. Prakash, O. (1961). Food and drinks in ancient India. Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd.
20. Rao, V. M., & Narasimham, B. (1977). Prolonging storage life of betel leaves. Indian Journal of Horticulture, 34(2), 175-182.
21. SATSA. (2013). Pan chas- Samasya o pratikar (Krishi Pustika 3). West Bengal.
22. Sengupta, K. (1978). Summary report on betel vine cultivation in West Bengal. Directorate of Agriculture, Government of West Bengal.

আমেরিকায় ভারতীয় পরিচয়ের বসবাসকারীদের সঙ্কট

ভারতীয়দের কাছে Dream American-র উড়ান দীর্ঘদিনের স্বপ্ন। আমেরিকার শুল্ক পণ্যের রপ্তানিতে ২০২৫ এর মধ্যভাগে ভারতীয় পণ্যের ৩৭.৫ শতাংশ ঘাটতি দেখা যাছে তাই নয় ২১ শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ থেকে কার্যকর নতুন নিয়মে H-1B ভিসার জন্য আবেদনকারী সংস্থাকে ১ লক্ষ ডলার দিতে হবে যার উপর ৭০% ভারতীয় নির্ভরশীল থাকেন আমেরিকা যাত্রা করার জন্য। শুধু তাই নয় H-1B ভিসার পর গ্রিন কার্ডেও নিয়ন্ত্রণ এনেছে ট্রাম্প প্রশাসন। গ্রিন কার্ড লটারি US Diversity Visa লটারিতে ২০২৮ সাল অব্দি ভারতীয়দের নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

এমনকি নানাভাবে ভারতকে অপমানও করা শুরু হয়েছে। অথচ এসব ঘটনায় প্রবাসী ভারতীয়দের প্রতিবাদ শোনা যায়নি।

এই নীরবতা বিস্ময়কর! US ক্ষমতার কেন্দ্রে প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে তাঁদের আইনত কোনো বাধা নেই। ভারতীয়-আমেরিকানরা সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় বোর্ড, থিঙ্কট্যাংক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতায় অনেক আছেন। তাঁরা রাজনৈতিক প্রচারে অর্থ অনুদান দেন, সিনেটরদের পরামর্শ দেন, নীতিনির্ধারণে ভূমিকা রাখেন। অথচ যুক্তরাষ্ট্রে সফরকালে কংগ্রেস সদস্যদের এক বৈঠকে এক মার্কিন প্রতিনিধি ভারতীয় এমপিদের জানিয়েছিলেন; তাঁর অফিসে ভারতের বিরুদ্ধে প্রশাসনের পদক্ষেপ নিয়ে কোনো ফোন কলই আসেনি। অথচ নিয়মিত ইসরায়েল ইস্যুতে তাঁর অফিসে অসংখ্য কল আসে। তাহলে কেন ভারতের বিরুদ্ধে এমন শাস্তিমূলক পদক্ষেপের সময় প্রবাসীরা মুখ খোলেন না?

এর একটা কারণ হয়তো ভারতীয়-আমেরিকানরা, বিশেষ করে প্রভাবশালী ব্যক্তিরা, প্রায়ই হাঁটেন এক অদৃশ্য দড়ির ওপর। তাঁদের সাফল্য নির্ভর করছে একধরনের ভারসাম্যের ওপর; তাঁরা দীপাবলি উদ্‌যাপন করবেন, তবে সচেতন থাকতে হয় যেন থ্যাঙ্কসগিভিং আড়ালে না পড়ে যায়। ভারতের পক্ষ নিয়ে জোরালোভাবে মুখ খোলা মানে যুক্তরাষ্ট্র সরকারকেই প্রকাশ্যে সমালোচনা করা। এতে প্রশ্ন উঠতে পারে; আপনার আনুগত্য আসলে কোথায়? আসলে মুখেতে গণতন্ত্রের কথা বললেও প্রবাসী ভারতীয়রা একধরনের হীনমন্যতা ও তৃতীয় শ্রেণির নাগরিকত্বের অনিশ্চয়তায় ভোগেন।

আমেরিকায় বসবাসরত ভারতীয়দের আতঙ্কের একটি বাস্তব দিকও রয়েছে। মার্কিন ভারতীয় বন্ধুদের অনেকে মিডিয়াতে বলেন, যারা এক প্রজন্ম আগে সেখানে গিয়ে স্থায়ী হয়েছেন, তাঁরা এখন মনে করেন এইচ-১বি ভিসা তাঁদের সন্তানদের সুযোগ কেড়ে নিচ্ছে। নতুন করে পড়াশোনা শেষ করা অনেক স্টেম (বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়) গ্র্যাজুয়েট; এমনকি কম্পিউটার সায়েন্সে ডিগ্রিধারীরাও বেকার হয়ে বসে আছেন। তাঁদের অনেকেই ভারতীয়-আমেরিকান। প্রযুক্তি কোম্পানিগুলো বেশি বেতনের ভারতীয়-মার্কিন কর্মীদের বাদ দিয়ে তুলনামূলক সুলভে পাওয়া এইচ-১বি ভিসাধারীদের কাজে লাগাতে চাইছে। এ কারণে এসব প্রবাসী পরিবারের কাছে নীরব থাকা মানে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নীতিকে নীরব সমর্থন দেওয়া।

ভারতে সমালোচনা হয়েছে যে, প্রবাসীরা যদি ভারতের বিরুদ্ধে নেতিবাচক নীতি প্রয়োগের সময় প্রতিরোধ না গড়ে তোলেন, তবে তাঁরা নিজেদের নৈতিক অবস্থান হারান। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রবাসীদের বলেছেন 'রাষ্ট্রের দূত', কিন্তু যদি সেই প্রতিনিধিত্ব বাস্তবে কোনো সমর্থনে না দাঁড়ায়, তবে তার মূল্য কোথায়?

এই প্রসঙ্গে আরও গভীর একটি প্রশ্ন উঠে আসে; প্রবাসী হওয়া মানে কী? এটা কি শুধু নস্টালজিয়া; বলিউড সিনেমা, বিরিয়ানি আর ভরতনাট্যম প্রেমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ? নাকি এর মানে রাজনৈতিক দায়িত্বও রয়েছে? যখন দেশের ক্ষতি হয়, তখন প্রতিবাদ করা, ক্ষমতাধরদের সামনে সত্য বলা; এই দায়িত্ব কি তাঁদের নেওয়া উচিত নয়? ভারত সরকার ২০২৩ সালে সংসদে জানায় যে, ২০১৮ থেকে ৪০৩ জন ছাত্রছাত্রী বিদেশের মাটিতে মারা গিয়েছে, যার মধ্যে ৯১ জন কানাডা ও ৩৬ জন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে। USA তে প্রতিনিয়ত প্রবাসী ভারতীয়দের অস্বাভাবিক মৃত্যুর খবর আসছে।

ভারতীয়-আমেরিকান সমাজের হাতে রয়েছে প্রচুর অর্থ, প্রভাব তাঁরা চাইলে মার্কিন কংগ্রেসে লবিং করতে পারেন, মিডিয়াকে প্রভাবিত করতে পারেন, জনগণকে সংগঠিত করতে পারেন। কিন্তু তার আগে দরকার; নিজস্ব অবস্থান থেকে স্পষ্ট ও নীতিভিত্তিক বক্তব্য দেওয়া। আমেরিকার সাধারণ জনগণ ভারতীয় শিল্পপতি থেকে ছাত্রছাত্রীদেরও ঘৃণা করে।

সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব অর্গানাইজড হেটের গবেষকরা গত এক বছরে ভারতীয়দের প্রতি ঘৃণার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে জানিয়েছেন। ঐ কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা রাকিব নায়েক বলেছেন, শুধু অক্টোবর ২০২৫-এ ভারতীয় ও ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিনদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচার করা ২৭০০টি পোস্ট করা হয়েছে। সত্যি, এক অনিশ্চিত ভবিষ্যত আজ তাই স্বপ্নের উড়ান-এ!!

ভূগোল স্বদেশচর্চা পত্রিকায় লেখা পাঠাতে ইচ্ছুকদের জন্য নির্দেশিকা

'ভূগোল স্বদেশচর্চা' বাংলা ভাষায় প্রথম সর্বভারতীয় ভূগোল পত্রিকা যা কিংবদন্তী ভূগোল অধ্যাপক সুভাষরঞ্জন বসুর পৃষ্ঠপোষকতায় ও উৎসাহে শুরু হয় এবং বিগত একুশ বছর ধরে বহু শ্রদ্ধেয় ভূগোলবিদের অনুপ্রেরণায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে। বছরে দুইবার প্রকাশিত (জানুয়ারি-জুন ও জুলাই-ডিসেম্বর) এই পত্রিকার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভূগোল চিন্তা ও চর্চার অবাধ আদানপ্রদান ও মননগত উপলব্ধি। ভূগোল চর্চায় সারা ভারতের এবং বাংলা ভাষাভাষি পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের প্রখ্যাত অধ্যাপক-শিক্ষক-গবেষক ছাড়াও বিভিন্ন মাধ্যমের বহু আগ্রহী মানুষ, এমনকী ছাত্র-ছাত্রীরা এখানে তাদের ক্ষেত্র সমীক্ষার অভিজ্ঞতা, মৌলিক চিন্তা ও সমসাময়িক অনুসন্ধানী পর্যবেক্ষণ বিগত দুই দশক ধরে সহজ ভাষায়, সহজ কথায় ভাগ করে চলেছেন। অত্যন্ত যত্ন সহকারে প্রতিটি রচনা স্বীকৃত রীতি অনুযায়ী পর্যালোচনা, মূল্যায়ন বা Peer Review করে লেখকের মূল ভাবনাটিকে অক্ষুণ্ণ রেখে ভূগোল স্বদেশচর্চা পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়। সর্বোপরি এই পত্রিকার জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ বাংলা ভাষার সাবলীলতা ও ভূগোলের বৃহত্তম ক্যানভাসের রামধনু রঙ্ কে আপনাদের সবার মনের মত করে সাজিয়ে দেওয়া।

সে সমস্ত উৎসাহী লেখকরা লেখা পাঠাবেন তারা দয়া করে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অনুসরণ করে চলবেন—

(১) প্রতিটি রচনার একটি শিরোনাম, সারসংক্ষেপ (১০০ শব্দের মধ্যে) ও লেখকের সাম্প্রতিকতম পদ ও কর্মস্থান বা জীবিকা, ই-মেল ও ফোন নাম্বার সঠিকভাবে প্রকাশ করে তবে রচনাটি প্রেরণ করবেন।

(২) সাধারণভাবে আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত নিয়মানুযায়ী Reference যে গুলি যথাযথভাবে ব্যবহার করা হয়েছে বা প্রাসঙ্গিক সেগুলি রচনার শেষে বর্ণপরিচয়ের অক্ষর বিন্যাস অনুযায়ী সাজিয়ে দেবেন। ইংরাজী ভাষায় দিতে চাইলে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী Journal, Edited Book, Unpublished Thesis, Printed Media বা Internet Source ইত্যাদির উৎস বিস্তারিত ভাবে স্থান ও সময়কালসহ উল্লেখ করবেন। কোথাও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করার বিষয় থাকলে শেষে অবশ্যই স্পষ্ট উল্লেখ করবেন।

(৩) সাধারণভাবে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানান অনুসরণ করা হয়। বিশেষ বিশেষ ভৌগোলিক পরিচয়ের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন শব্দ বা সেরকম জনপ্রিয় নয় বিশেষণ ব্যবহার করলে পাশে বন্ধনীর মধ্যে ইংরেজী শব্দটি দিয়ে দেবেন। খুব প্রয়োজন ছাড়া ইংরেজী বা অন্য ভাষার কোটেশন বা বিবৃতি ব্যবহার করবেন না।

(৪) প্রত্যেক লেখা A4 Size Paper-এ 12 pt. এ বাংলায় যে কোন সুপাঠ্য font-এ PDF করে অবশ্যই সম্পাদককে ই-মেল-এ পাঠাবেন। মানচিত্র বা ছবি পৃথকভাবে লেখার সাথে যুক্ত করে পাঠাবেন যাতে সরাসরি সেই ছবি যা মানচিত্রটিকে রচনায় যথাযথ মানে ব্যবহার করা যায়। লেখা ও ছবির মান সংক্রান্ত সমস্ত দায়িত্ব লেখকের; আমরা সেটি পাবার পর কোন প্রয়োগগত সমস্যা দেখা দিলে লেখককে জানান হবে এবং তাকেই নিজ দায়িত্বে সেটি সমাধান করতে হবে। রঙীন ছবিসহ রচনা প্রকাশ করা হয় না । বিশেষক্ষেত্রে কোন লেখক বা লেখিকা সামগ্রিক দায়িত্ব নিয়ে আংশিক /সমগ্র পত্রিকা রঙীন প্রকাশ করতে চাইলে স্বাগত জানানো হয়, তবে এ বিষয়ে প্রকাশকের মূল্যায়ন ও সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। পূর্বানুমতি নিয়ে (ফোন : ৯৪৩৩৬০৩৬৮১) লেখা পাঠাবার **ই-মেল : sisir@bhugolswadeshcharcha.org**

(৫) প্রতিটি রচনা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেবার পূর্ণাঙ্গ ও চূড়ান্ত অধিকার সম্পাদক ও প্রকাশকের।

অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া হয় না। মনোনীত হলে লেখক/লেখিকা ২ কপি পত্রিকা বিনামূল্যে পাবেন। একাধিক লেখক/লেখিকা হলে প্রত্যেকে ১ কপি করে পত্রিকা পাবেন।

২০২৩ সাল থেকে সম্পাদকের পূর্বানুমতি ছাড়া ও পত্রিকার নিয়মবিধি মেনে এককালীন রেজিস্ট্রেশন না করে লেখা পাঠালে বিবেচিত হচ্ছে না। একমাত্র প্রাক্ অনুমোদিত লেখক-লেখিকার গবেষণা পত্র প্রকাশিত হবে।

২০১৯ সালে ইউজিসি অনুমোদিত জার্নাল তালিকা অন্তর্ভুক্ত হয়।